হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

আষাঢ় * ১৪২১

একোনপঞ্চশৎ বর্ষ * তৃতীয় সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী
সংঘাচার্য ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী
সংঘ-সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক
শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ
কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ
শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ
শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ
শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ
৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় ৫৬
শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ৫৭
মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ৫৯
চির অমলিন সেই প্রথম চরণ চিহ্ন *
দেবকুমার চক্রবর্তী ৬১
গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য্য *
শ্রী প্রদীপ দাস ৬৪
জীবন খাতার পাতায় পাতায় *
শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ৬৯
ভক্তপ্রিয় জগন্নাথ *
অতৃণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১
একটি বিরল মহাপ্রয়াণ মহোৎসব *
কিঙ্কর সমীরণ ৭৪
মহারাজের সঙ্গে মহাপ্রয়াণ মঠে *
কিঙ্কর সমীরণ ৮১
মহামিলন মঠে...শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসব * ৮৪
শ্রীনামরক্ষা তহবিল ঃ একটি...আবেদন * ৮৫
আনন্দ সংবাদ * ৮৬

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

গুরুপূর্ণিমা পূর্ণতার তিথি। বেদব্যাসের আবির্ভাবও আজই। এই তিথিতেই তিনি বেদবিভাজন করেছিলেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই লগ্ন শ্রীগুরুপূজার জন্য চিহ্নিত। পরমগুরুদেব শ্রীমদ্ দাশরথিদেব যোগেশ্বর শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেবকে স্বপ্নে বলেছিলেন—'আমাদের গুরুপ্রপন্নতার পথ।' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সমগ্র লীলায় কীভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে হয়, তা জীবকুলকে শিখিয়েছেন। তিনি শ্রীগুরুপাদুকা বক্ষে ধারণ করে সমগ্র ভারতে শ্রীনামপ্রচার করেছেন। তাঁর রচিত সব গ্রন্থের সূচনা হয়েছে তাঁর গুরুদেবের চিত্র ও আশীর্বাণীর মাধ্যমে। তিনি শিষ্য অশিষ্য নির্বিশেষে সকলকে চিঠিতে সম্বোধন করতেন শ্রীগুরু বিগ্রহেষু এবং মায়েদের ক্ষেত্রে লিখতেন শ্রীগুরুমূর্তিষু। তিনি তাঁর শিষ্য সন্তানদের অনেককেই শ্রীগুরুদেবের লীলাবিগ্রহ বলে নির্দেশ করেছিলেন। সকলের মধ্যে শ্রীগুরুই যে লীলা করছেন—সেই দৃষ্টি উন্মোচন করে তিনিই একমাত্র যিনি শিষ্যের চিত্রপটের সামনে দণ্ডবৎ করেছেন! আমরা বিস্ময়ে কিছু বললে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—দীনবন্ধু সীতারামের প্রণম্য!! আসলে এই অনন্যলীলা তিনিই সংঘটন করতে পারেন, কারণ তিনি যে নির্নমাকার। 'আমি' ভূমিতে 'নমস্কার' কোথায়? ব্রজনাথগাথা ও অভয়বাণীর প্রবক্তাই এভাবে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত প্রণিপাতের একমাত্র সুযোগ্য পাত্র। সাধারণ বা সিদ্ধ সাধকের পক্ষে এমন আচরণ সহজসাধ্য নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর হলেন অশব্দ-অস্পর্শ, তিনি অসঙ্গ এবং নির্বিকার-নিরঞ্জন, তাই তিনি শুধু সম্প্রদায়ের প্রথম সর্বাধীশ দীনবন্ধু ঘোষের প্রতিকৃতিতেই নয়, ১৯৮২ সালের মহালয়ার দিন মহামিলন মঠে সমবেত কয়েক হাজার শিষ্য ভক্তকুলকে নমস্কার করতে পারেন! তাঁর এই নমস্কার রূপ শিক্ষা অনেকের হজম হয়নি, বোঝেনও নি অনেকেই—তবু তিনি জীবকুলকে মুক্তির যে চাবিকাঠি দিলেন তার অন্যতম হল নাম ও প্রণাম।

শ্রীজগন্নাথ তিনি শ্রীওঙ্কারনাথ, তাঁর দীক্ষার নাম নিরাধারা বা জ্ঞানবতী দীক্ষা। তিনি স্পর্শ, দৃষ্টি বা মনের মাধ্যমে শিষ্যের সত্তায় শক্তি সঞ্চার করেছেন। তাঁর ধারায় আমাদের সম্প্রদায়ে তাই আজও তিনিই সকলকে আশ্রয় দেন। পৌঁছে দেন পূর্ণতায়। আজ এই শ্রীগুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে তাঁর অনুধ্যানই আমাদের উপাসনা। তিনি শ্রীগুরুমহিমামৃতে জানিয়েছেন—'শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিলে দেহ ব্রহ্মভূত হইয়া যায়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং প্রকাশ, তাঁর সামনে চন্দ্র সূর্যের জ্যোতিও ম্লান হয়। তাঁর কাছে বেদও মৌন থাকে। তিনি যাঁর প্রতি কৃপা কটাক্ষ করেন সেই ভাগ্যবানের দৃষ্টিতে সৃষ্টি রঙ্গময় হয়ে যায়। তিনি কলিযুগের মানুষের প্রতি শুধু করুণা করে তাদের চিত্তভূমিকে শুদ্ধ করে জ্ঞানবীজ বপন করেছেন, আর তাতে উৎপন্ন হয়েছে 'প্রেম' সুধাধারা। তাঁর কৃপা কৃতার্থের 'আমি' 'তুমি' সব চলে যায়। জীব-শিব ভেদ থাকে না! তিনি সেই আনন্দলাভ করেন যাতে কোটি কোটি আনন্দ বাস করে! 'আমি গুরুর আমার গুরু'—এই তত্ত্বের রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। ভিতরে বাইরে তখন এক উদ্ভাসিত ওঙ্কার। শুধু ওঙ্কার। যিনি শ্রীগুরুদেবেরই স্বরূপ। আমরা প্রণাম জানাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তম অধ্যায়, চণ্ডমুণ্ডবধ

প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারা তবে কে?

উত্তর ঃ অকারশ্চ ভবেদ্ ব্রহ্মা উকারঃ সচ্চিদাত্মকঃ।
মকারো রুদ্র ইত্যুক্তঃ ইতি তস্যার্তকল্পনা॥

অকার ব্রহ্মা, উকার সচ্চিদানন্দময় বিষ্ণু, মকার রুদ্র—সকলই আমার প্রণবময়ী মাতা।

"একো♦হং বহুস্যাম্"

—একমাত্র তিনি বহুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। লীলা করিবার জন্য তিনিই নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই চতুর্দ্দশ ভুবন, তিনিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডের অতীতা—তাঁর একপাদে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে বিলীন হইতেছে। কে তার ইয়ত্তা করিতে পারে।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥ ১৪

অন্বয় ঃ যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্ তদ্বদেব হি তৎশক্তিঃ অসুরান্ যোদ্ধুং আযযৌ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ ঃ যে দেবতার যেমন রূপ, যেরূপ ভূষণ বাহন—সেই রূপই তাঁহাদের শক্তিসমূহ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিলেন॥ ১৪

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ যস্য দেবস্য যৎ যাদৃগ্ রূপং আকৃতিঃ যথা ভূষণবাহনং ভূষণং কমণ্ডল্বক্ষমালাদি, বাহনং হংসাদি অনতিক্রমা তদ্বদেব তাদৃগেব হি তচ্ছক্তিঃ তস্য দেবস্য শক্তিঃ অসুরান্ দানবান্ যোদ্ধুং প্রহর্ত্তুং আযযৌ আগবতবতী।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥ ১৫

অন্বয় ঃ অগ্রে হংসযুক্তবিমানা সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ আয়াতা সা ব্রহ্মাণী (ইতি) অভিধীয়তে।। ১৫

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রথমে হংসযুক্ত বিমানে জপমালা কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন ইনি ব্রহ্মাণী বলিয়া অভিহিতা হন।। ১৫

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অগ্রে প্রথমে হংসযুক্তবিমানা হংসযুক্তং বিমানাং যস্যাঃ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ অক্ষসূত্রং জপমালা কমণ্ডলু যতীনাং জলপাত্র ভাজন-বিশেষঃ তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানা। (জপমালা ও যতীগণের জলপাত্রভাজন ধারিণী) ব্রহ্মণঃ চতুর্ম্মুখস্য শক্তিঃ আয়াতা আগতা সা চ ব্রহ্মাণী (ইতি) অভিধীয়তে কথ্যতে।

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণ॥ ১৬

অন্বয় ঃ বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী মহাহিবলয়া চন্দ্ররেখাবিভূষণা মাহেশ্বরী প্রাপ্তা।। ১৬

বঙ্গানুবাদ ঃ বৃষভবাহিনী শ্রেষ্ঠ ত্রিশূলধারিণী মহাসর্প-বলয়া চন্দ্রকলা-বিভূষণা মাহেশ্বরী উপস্থিত হইলেন।। ১৬

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ বৃষ্যারূঢ়া বৃষভবাহিনী ত্রিশূলবরধারিণী ত্রিশূলবরং ত্রিশূলশ্রেষ্ঠং ধর্ত্তুং শীলং যস্যাঃ (তত্ত প্রঃ) মহাহিবলয়া মহান্ অহিবলয়ঃ সর্পময় বলয়ো যস্যাঃ; যদ্বা মহাহী অশ্বতর-তক্ষকৌ বলয়ৌ যস্যাঃ সা (তত্ত্ব প্রঃ)

মহাহী তক্ষকানন্তৌ বলয়ৌ (নাগোজী) চন্দ্ররেখাবিভূষণা চন্দ্রখণ্ডং ভূষণং যস্যাঃ (তত্ত্ব প্রঃ)। চন্দ্ররেখা চন্দ্রকলা সৈব বিভূষণং যস্যাঃ (নাগোজী)।

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥ ১৭

অন্বয় ঃ ময়ূরবরবাহনা শক্তিহস্তা চ গুহরূপিণী কৌমারী অম্বিকা দৈত্যান্ যোদ্ধুং অভ্যাযযৌ।। ১৭

বঙ্গানুবাদ ঃ ময়ূরশ্রেষ্ঠ আরোহণে শক্তিহস্তা কার্ত্তিকেয় সমানাকারা কার্ত্তিকের শক্তি অম্বিকা দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিলেন।। ১৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ময়ূরবরবাহনা ময়ূরশ্রেষ্ঠো বাহনং যস্যাঃ। শক্তিহস্তা শল্যং হস্তে যস্যাঃ গুহরূপিণী কার্ত্তিকেয়রূপিণী কৌমারী কুমারসম্বন্ধিনী কার্ত্তিকেয়শক্তিঃ অম্বিকা দৈত্যান্ দানবান্ যোদ্ধুং অভ্যাযযৌ আভিমুখ্যেনাগতবতী।

তথৈব বৈষ্ণবীশকিতর্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাহস্তাভ্যুপাযযৌ॥ ১৮

অন্বয় ঃ তথৈব গরুড়োপরি সংস্থিতা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাহস্তা বৈষ্ণবী শক্তিঃ অভ্যুপাযযৌ।। ১৮

বঙ্গানুবাদ ঃ সেইরূপ গরুড়ারোহণে শঙ্খচক্রগদাধনু-খড়্গাহস্তা বৈষ্ণবী শক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন।। ১৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তথৈব তদ্রূপৈব গরুড়োপরিসংস্থিতা বৈনতেয়োপরি উপবিষ্টা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাঃ হস্তেষু যস্যাঃ বৈষ্ণবীশক্তি বিষ্ণুসম্বন্ধিনীশক্তিঃ অভ্যুপাযযৌ আভিমুখ্যেন উপ সমীপমাযযৌ।

প্রশ্ন ঃ দেবীর হস্ত কয়টি?

উত্তর ঃ নাগোজী বলেন—ষড়ভূজা—

''বাহুভির্গরুড়ারূঢ়া শঙ্খচক্রগদাসিনী।
শার্ঙ্গবাণধরা জাতা বৈষ্ণবীরূপশালিনী।।''

—বামনপুরাণে এইরূপ ষড়ভূজার কথা আছে। শার্ঙ্গ এই পদের দ্বারা তিনি বাণেরও উপলক্ষণ করিয়াছেন।

তত্ত্বপ্রকাশিকা চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। 'শৃঙ্গস্য বৃষাণস্যায়ং শার্ঙ্গঃ, তন্মুষ্টিময়ত্বাৎ লক্ষণয়া খড়্গোঽপি শার্ঙ্গ উচ্যতে কৃষ্ণসারঙ্গপটবৎ, স চাসৌ খড়্গাশ্চেতি। যদ্বা শৃঙ্গং প্রধানং স্বার্থে টণ্ শার্ঙ্গঃ প্রধানঃ চাসৌ খড়্গাশ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ, ত্রিশূলবরবৎ।'

অষ্টভুজাপক্ষে—'তথা শঙ্খসাহচর্য্যাৎ পদ্মং শার্ঙ্গং ধনুঃ তৎ সাহচর্য্যাৎ শরশ্চ, খড়্গা সাহচর্য্যাৎ চর্ম চ গ্রাহ্যম্।'

চতুর্থে—'শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্ম ব্যগ্রৈ র্হিরণ্ময় ভুজৈরিব।' ইঁহারা চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা অষ্টভূজার কথা বলিলেন আরও কত যে হস্ত আছে কে ইয়ত্তা করিতে পারে।

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্।। ১৯

অন্বয় ঃ অতুলং যজ্ঞবারাহং রূপং বিভ্রতো হরেঃ যা শক্তিঃ সাপি বারাহীং তনুং বিভ্রতী তত্র আযযৌ।। ১৯

বঙ্গানুবাদ ঃ অনুপম যজ্ঞবারাহরূপধারিণী হরির যে বারাহী শক্তি তিনিও বারাহী তনু ধারণ করিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন।। ১৯

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অতুলং অনুপমং যজ্ঞবারাহং রূপং যজ্ঞাঙ্গকল্পিতবারাহাকারং বিভ্রতো ধারয়তো হরেঃ বিষ্ণোঃ যা শক্তিঃ সাপি বারাহীং বরাহসম্বন্ধিনীং তনুং মূর্ত্তিং বিভ্রতী ধারয়ন্তী তত্র যুদ্ধে আযযৌ আগতবন্তী।

প্রশ্ন ঃ বারাহ শক্তির কথা তো বলেন নাই।

উত্তর ঃ বিষ্ণুশক্তি—ইহার দ্বারা বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ত্রিশক্তিকেই বলা হইয়াছে।

-ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ

উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ

(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কিঙ্করী যোগমায়া দেবী

আজ তোমার কাছে মোর একটি নিবেদন
ক্ষণিকের তরে ভুলিও না যেন শ্রীগুরুচরণ।
শ্রীগুরুরূপে এসেছিলে ভগবান
মোদের তরে সদাই কাঁদিত প্রাণ।
বাহিরে আজি খুঁজিয়া না পাই
দেখি হৃদয় মন্দিরে নিয়েছ যে ঠাঁই,
স্থূলের কাজ ফুরায়েছে আজি,
সূক্ষ্মে মোদের ভরিয়া দিতেছ সাজি।
ওগো আনন্দময় এ সূক্ষ্মানন্দে
ভরিয়া দাও মোদের জীবন।
তব আদর্শ মাথায় নিয়ে
ভুলিনা যেন তোমার চরণ॥

ঠাকুরের বহুলীলা কথাই মনের মধ্যে জেগে ওঠে সর্বক্ষণ। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পূর্বে স্নানযাত্রার লীলাকথা আজ খুব মনে পড়ছে। স্নানযাত্রার দিনে বাড়িতে (জগন্নাথ নিবাসে) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান হয়ে যাবার পর, সেবিকা ডুমুরদহে যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। সেবিকা বাড়ি থেকে যাবার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানের জল বোতলে করে নিয়ে এবং তার সঙ্গে স্নানযাত্রার সময় যা যা দিয়ে প্রভুকে স্নান করানো হয়। যেমন ডাবের জল, অগুরু, চন্দন, দই, গঙ্গাজল, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য আরও অনেক কিছু নিয়ে সেবিকা ডুমুরদহে গেছিল। কারণ সেবিকার অন্তর ছট্‌ফট্‌ করছিল তার শ্রীগুরু জগন্নাথদেবকে ঐ পুণ্য দিনে ডুমুরদহে স্নান করানোর জন্য। যাইহোক ডুমুরদহে যাবার পর সেবিকার কাছে স্নানযাত্রার জল এবং ঠাকুরকে স্নান করানোর জন্য যা যা সেবিকা সঙ্গে নিয়ে গেছিল সেই সমস্ত দেখে ঠাকুরের এক শিষ্যা মা উত্তেজিত হয়ে বলে ঠাকুর আবার ঐ সমস্ত দিয়ে স্নান করবে নাকি! সেবিকা হেসে বলেছিল ঠাকুরের না করার কিছুই নেই। তাঁর ইচ্ছা হলে সবই সম্ভব। এদিকে সেবিকাকে দেখে ছোড়দা (গুরুপুত্র), ছোট বৌদি (গুরুপুত্রবধূ) খুব খুশি, সেবিকা ছোড়দা, ছোটবৌদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে ঘি মাখানোর কথা বলতেই তাঁরা খুশি মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ঘি মাখাতে শুরু করে দেয়। তাঁরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করার সুযোগই পায় না, কারণ সবসময় ভিড় লেগেই থাকে। এরপরই সেবিকার ঠাকুরের স্নানের জন্য দুধের কথা মনে পড়তেই ছোটবৌদিকে জিজ্ঞাসা করায় ছোটবৌদি বলেন যে সকালের দুধ তখনও পর্যন্ত গরম করা হয়নি। তা শুনে সেবিকার মন আনন্দে ভরে যায়, প্রভু যেন তার সমস্তটি প্রস্তুত করে রেখেছেন। এরপর বালতি করে দুধ নিয়ে তার সঙ্গে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া সবকিছু মিশিয়ে এক বালতি ভরতি করা হলো। এদিকে ঠাকুরের ঐ শিষ্যা মা এইসব দেখে ঐ একই কথা বলে চলেছে, ঠাকুর ঐসব দিয়ে আবার স্নান করবে! সেবিকা বলেছিল দেখো না, ঠাকুর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘি মাখানো হয়ে গেছে; আর ঠিক তারপরই শ্রীশ্রীঠাকুর সেবিকার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'হ্যাঁরে, আজ তো স্নানযাত্রা, একে স্নান করাবি না। এই কথা শুনে সেবিকার মন এক অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা ভগবান ঠিকই পূরণ করবেন। এরপর সেবিকা, ছোড়দা এবং ছোটবৌদি মিলে ঐ বালতি থেকে মেশানো সমস্ত জল দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্নান করানো হলো। তাই যে লীলা হয়ে গেছে। তিনি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, তা না হলে ঠাকুর সেদিন স্নানযাত্রার কথাই শুধু বলতে পারতেন। স্নান করানোর কথা বলবেন কেন? সেবিকার এই দেখেই চিন্তা জাগে যে মানুষ কী করে এত দেখে শুনেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে যার যা প্রারব্ধ তাকে তো তা ভোগ করতেই হবে। কিন্তু এজন্যই ঠাকুর সতীশ সংঘ করেছেন যাতে সেখানে ঠাকুর কথা শুনে, মন্ত্র জপ করে, স্মরণে মননে তাঁকে রাখতে পারি। বিনা প্রেমে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মন্ত্র কাজ করে। কলিযুগে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মতো যাগযজ্ঞ করার সময় নেই। ভগবৎ-রামায়ণ, মহাভারত যখন রচিত হয়েছে তখন তো কেউ তা পড়েনি। কলিযুগে মানুষ সেগুলো পড়ছে। উপলব্ধি করছে। সব সময় আমার আমার না করে তাঁর চরণে সমর্পিত প্রাণা হতে হবে। ঠাকুর বলছেন 'আমি ভক্তাধীন। ঠাকুর মন্দিরে নন, মানুষের অন্তরেই বিরাজ করছেন। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, তেমনি ঠাকুরকে পেতে হলে মাথা নত করতে হবে। তিনি দয়া করবেনই এই বিশ্বাস নিয়ে শ্বাসে জপ ধরে রেখে গুরুময় হয়ে থাকলে তিনি কৃপা করবেনই। এ কারণে ঠাকুরকে বলি 'কৃপা আমি পেয়েছি অনেক। তুমি এত কৃপা করেছ, অপরাধ যদি করে থাকি, ক্ষমা করে নিও প্রভু।'

'বুকভরা ভালবাসা নিয়ে নেয় টেনে বুকে,
সবার পাপটি নিয়ে, পাপীরে তরায়,
যে পাপী তরাবার তরে এসেছ ধরায়।
সংসার মাঝে পাই কতই যাতনা,
সে যে কাছে এসে ভুলায় সকল বেদনা
সুন্দর হতে সুন্দর তুমি, তুমিই হে সীতারাম
তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই বুদ্ধ, তুমিই রাজারাম।
স্মরণ তোমার ভুলিনা যেন এই মোর প্রার্থনা
তব চরণে লহ হে প্রণাম মোদের সবার।।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসব

আশুতোষ মঠ, রাঙাপাড়া, বার্ণপুর

অন্যান্য বৎসরের মতো এই বৎসরও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'আশুতোষ মঠে' গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব বেশ সাড়ম্বরেই পালিত হল। ঐ নির্দিষ্ট পুণ্যদিনটিতে ভোর ৪-৪৫ মিঃ শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের সূচনা হয়—পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশিত পথে প্রার্থনা, শ্রীশ্রীগুরুপূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানগুলি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

দিনটি আষাঢ় মাসের বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ার বদলে যথেষ্ট উষ্ণ থাকলেও, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত ও শিষ্যদের উপস্থিতি কম ছিল না। প্রায় ৭০০ ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ধারাটি আজও অক্ষুণ্ণ রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদেরকে মা অন্নপূর্ণার কৃপা থেকে বঞ্চিত করেন নি।

পরম পূজ্যপাদ (সর্বাধীশ) শ্রীমদ্ বিঠ্ঠলদেবের নির্দেশ মতো এবং পূজ্যপাদ সামানন্দজীর অনুপ্রেরণাকে সামনে রেখে আশুতোষ মঠ এবং ওঙ্কারনাথ মিশনের প্রায় সকল ভক্ত ও শিষ্য মণ্ডলীর একত্র সহযোগিতা এবং উপস্থিতিতে এবং সতীসংঘের মায়েদের সুলালিত নামযজ্ঞের শেষে প্রায় সন্ধ্যে ৬-৩০টির উৎসবটির বিশ্রামের পথ নেয়। সান্ধ্যকালীন পাঠ ও প্রার্থনা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনা জানাই যেন আবহমাসকাল ধরে শ্রীশ্রীসীতারাম ঘরানার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের সাথে সকলকে শ্রীশ্রীগুরুসেবার সুযোগ করে দেন।

গুরু কৃপাহি কেবলম্

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিত্যদাসানুদাস
শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায়, বার্ণপুর

চির অমলিন সেই প্রথম চরণ চিহ্ন

দেবকুমার চক্রবর্তী

পূজনীয় সদানন্দদাদার সঙ্গী হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্রসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছি। 'পথের আলো' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় সে সব কতা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। একবার ঠাকুর সদানন্দদাদার বাড়ীতে আমাকে ডেকে পরদিন খুব ভোরে আমাদের বাড়ীতে আসবেন বলেছিলেন। বলেছিলেন—'তোরা প্রস্তুত থাকিস্!' যথাসাধ্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু কোনও কারণবশতঃ ঠাকুরের আসা হয়নি। স্বভাবতঃই খুব ব্যথিত হয়েছিলাম। সেই বিরহ বেদনার কথাও রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঠাকুর যখন প্রথম আমাদের গৃহে শুভ পদার্পণ করেছিলেন সেই মিলনগাথার কথা বর্ণনা করা হয়নি। আজ সেই কথা লিখবার চেষ্টা করছি।

প্রথম যৌবনে যখন গুরুর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায় শ্রীশচীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের পূজনীয় সদানন্দদাদার কাছে নিয়ে আসেন। আমরা সদানন্দদাদার কাছে গিয়ে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও তাঁর উপদেশাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। আমরা বলতে আমাদের মাষ্টারমশায় শচীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আমি ও আমার ভ্রাতৃপ্রতিম গুরুভ্রাতা তপন সরকারের কথা বলছি। সদানন্দদাদা ঠাকুরকে আমাদের কথা বলেন এবং ঠাকুর আমাদেরকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন। সেই সময়ে ঠাকুর মস্তক মুণ্ডন, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি করে দীক্ষা দিতেন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেইসব কড়াকড়ি করা হয়নি। আমাকে কিছুই করতে হয়নি, তপনকে সংকল্প করে গঙ্গাস্নান করতে হয়েছিল। আমাদের দীক্ষা হয়েছিল পানাগড়ের কাছে (বর্ধমান জেলা) সোঁয়াই গ্রামে, ইংরাজীর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। সোঁয়াই গ্রামে ঠাকুরের একটি আশ্রম আছে। এখানে অধ্যক্ষ ঁশ্রীসত্যকালী মুখোপাধ্যায়ের আদি গ্রামের বাড়ী। তারপর ইংরাজীর ১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে ঠাকুর আমাদের সস্ত্রীক বসিয়ে আবার (বার্ণপুর আশুতোষ মঠ) মন্ত্র দেন।

আগেই বলেছি আমরা মাঝেমাঝেই রাণীগঞ্জে সদানন্দদাদার কাছে যেতাম ও সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করতাম। সদানন্দদাদা ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্যদের অন্যতম। মাষ্টারমশায়ও একজন উচ্চকোটির সাধক ও দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং আলোচনা বেশ জমে উঠত। আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম ও অধিকাংশ সময়ে শ্রোতা হয়ে শুনতাম। এখন মনে হয়—তে হি নো দিবসা গতাঃ। হায় কি মধুর দিনগুলিই না কেটে গিয়েছে!

আমরা ছাড়াও রাধামাধব গোস্বামী, উৎপল মুখার্জী, অমিয় রায়, হেমন্ত ব্যানার্জী ইত্যাদি অনেকে আমাদের সঙ্গে আসতে শুরু করলেন। আমরা অনুরোধ করলাম 'আপনি যদি মাসে একদিনও বার্ণপুরে আসেন, তবে আমাদের মত আরও অনেকে উপকৃত হতে পারেন। সদানন্দদাদা সম্মত হলেন। প্রথমে একদিন বার্ণপুর নিউটাউনে আমাদের সভা হল। তারপর ২।৩বার বার্ণপুরে গোপাল আয়েঙ্গার দাদার বাড়ীতে অথবা 'বার্ণপুর ফেব্রিকেটরস্'-এর মানিকদাদার বাড়ীতে সভার আয়োজন করা হল। এই সময়ে কলকাতায় সভার কথা শুনে ঠাকুর খুবই আনন্দিত হন। সদানন্দদাদাকে নিয়মিত বার্ণপুর যেতে বলেন। বলেন যে—তোর প্রয়োজন না থাকলেও এর (অর্থাৎ ঠাকুরের)

প্রয়োজন আছে। তখন থেকে বারি ময়দানে টাউন পূজা প্রাঙ্গণে প্রতি রবিবার নিয়মিতভাবে সভার আয়োজন করা শুরু হল। শহরের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ার জন্য এখানে অনেক লোক সমাগম হত। যে যা প্রশ্ন করতেন সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা হত। আমরা কেউ কেউ আলোচনার বিষয়বস্তু লিখে রাখবারও চেষ্টা করতাম।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ঠাকুর একবার বেলরুই আশ্রমে আসেন। সদানন্দদাদা আমাদের বললেন, 'তোমরা একটি গাড়ী নিয়ে বেলরুই দাশরথি মঠে যাবে। বাড়ীতে একটু প্রস্তুতি রাখবে। ঠাকুরকে তোমাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাব। তারপর ঠাকুরের ইচ্ছা।

আমরা যথাসময়ে বেলরুই দাশরথি মঠে উপনীত হলাম। রাণীগঞ্জ থেকে সদানন্দদাদাও এসে পৌঁছুলেন। সদানন্দদাদা আমাদের ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন। মাষ্টারমশায় শচীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আমি ও তপন সরকার। আমরা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। ঠাকুর আমাদের সস্নেহে বসতে বললেন। তারপর সদানন্দ দাদাকে বললেন—কি খবর? সদানন্দদাদা বললেন—বাবা, একটি প্রার্থনা আছে। আমাদের দেখিয়ে বললেন —বাবা, প্রার্থনা আছে। আমাদের দেখিয়ে বললেন—বাবা, এরা সীতারামের আদর্শ প্রচারের জন্য আসানসোল ও বার্ণপুরে নিয়মিত সভার আয়োজন করে। ভক্তদের একত্রিত করে নিয়ে আসে। এদের চেষ্টায় আসানসোল-বার্ণপুরে একটি আদর্শনিষ্ঠ, সীতারাম-নিবেদিত-প্রাণ ভক্তগোষ্ঠি তৈরী হয়েছে। আজকে যদি ফেরার পথে এদের বাড়ীতে একবার পদধূলি দেন তবে বড়ই ভাল হয়। আমাদের কাজেরও সুবিধা হয়। ঠাকুর এককথায় রাজি হলেন। বললেন—হাঁ রে রাস্তায় পড়বে তো? সদানন্দদাদা বললেন—এদের বাড়ী বেশী দূরে নয় কাছেই। ঠিক হল আমাদের গাড়ী ও সদানন্দদাদার গাড়ী সামনে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক পিছনেই থাকবে ঠাকুরের গাড়ী।

প্রথমেই পড়ল আমাদের বাড়ী। তখন এই অঞ্চলে (আসানসোল, রবীন্দ্রনগর) বেশী বাড়ীঘর হয়নি। আমাদের বাড়ীর পিছনদিকে ছিল খানিকটা ফাঁকামাঠ। ঠাকুরের গাড়ী পিছে পিছে অনেকগুলি গাড়ী পিছনের মাঠে এসে দাঁড়াল। সেইসময়ে কতকগুলি পারিবারিক কারণে আমাদের বাড়ীতে কোন আসবাবপত্র ছিল না। সব ঘর ফাঁকা। কিন্তু সব ঘর রং করা হয়েছে। উজ্জ্বল আলোতে সব ঘর ঝলমল করছে। সব ঘরে কম্বল বিছিয়ে রাখা হয়েছে কেবল ঠাকুরের বসার জন্য ভাল কম্বল দেওয়া একটি কাঠের চেয়ার রাখা হয়েছে। ব্যবস্থা দেখে সকলেই মোটামুটি খুশি। ঠাকুরের সঙ্গে সর্বাধীশ তারকদা ছিলেন। আমরা গুরুবরণ বা অভ্যর্থনার সব নিয়ম জানি না। ঠাকুরের ঢোকার সময় শঙ্খ বাজান হচ্ছে কিন্তু জলধারা দেওয়া হয়নি। তারকদা বললেন জলধারা দিয়ে নিয়ে চলো। তখন জলধারা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ঠাকুর সব ঘর ঘুরে দেখলেন তারপর বললেন তোর মাতামহ কুলদা প্রসাদের ছবি আছে? মাতামহ কুলদা প্রসাদের ছবি ঠাকুরের হাতে দেওয়া হল। ঠাকুর বললেন—এটি অল্প বয়সের ছবি। তারপর আমাকে বললেন—'তোর মাতামহের লেখা কোন বই তোর কাছে আছে?' অনেকগুলি বইই ছিল। তার মধ্যে থেকে 'ভাগবত ধর্ম' বলে একটি বই-এর দুটি খণ্ড ঠাকুরের হাতে দেওয়া হল। ঠাকুর এই দুটি ওমানন্দদাদার হাতে দিলেন। বললেন—বই পড়ে ফেরৎ দিবি এবং বই এর বিষয়বস্তুর কথা একে (ঠাকুরকে) জানাবি। আপনারা জানেন ঠাকুরের জীবনীতে আছে বিবাহের পূর্বে ঠাকুর যখন বাড়ী থেকে পালিয়ে পুরী যাচ্ছিলেন তখন কাটোয়ায় ঠাকুরের সঙ্গে কুলদা প্রসাদের দেখা হয়। কুলদা প্রসাদ প্রতিভাবান বৈরাগ্যদীপ্ত যুবক সীতারামকে টোলের অধ্যাপক হতে, পত্রিকার সম্পাদক হতে কিংবা অবতার হতে অনুরোধ করেন। স্বভাবতঃই ঠাকুর রাজী হননি। এই ঘটনার অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করেন। পূজনীয় সদানন্দদাদা বলেছিলেন—যাঁরা প্রথম ঠাকুরের মধ্যে অবতারত্বের লক্ষণ দেখেছিলেন তাদের মধ্যে কুলদা প্রসাদ একজন।

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। এই ঘটনার হয়ত কিছু সময় পরে আর

একজন প্রতিভাবান যুবকের সঙ্গে কুলদা প্রসাদের দেখা হয়েছিল। তার নাম জে. কৃষ্ণমূর্তি। কুলদা প্রসাদ কৃষ্ণমূর্তির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—তুমি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হবে। তিনি কৃষ্ণমূর্তির লেখা একটি ইংরাজী বই বাংলায় অনুবাদ করেন। বইটির নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীগুরুচরণে।' কৃষ্ণমূর্তি সম্বন্ধে কুলদা প্রসাদের ভবিষ্যতবাণী সত্য হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এই ঘটনার আরও কিছুদিন পরে ঠাকুর শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' বইটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি সেই উদ্ধৃতির সারাংশটুকু এখানে লিখছি। উদ্ধৃত অংশে লেখক প্রমোদ কুমার কুলদা প্রসাদের অতিথি বৎসলতার কথা বর্ণনা করেছেন। লেখক সিউড়িতে কুলদা প্রসাদের বাড়ীতে কয়েকদিন অতিথিরূপে অবস্থান করেছিলেন। তিনি লিখেছেন কুলদা প্রসাদরা শিক্ষিত পরিবার। কিন্তু বাড়ীতে সনাতন প্রথায় অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। বাড়ীতে গৃহদেবতা সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা, পূজা, ভোগ, আরতি ইত্যাদি হয়। ছোট ছেলে-মেয়েরা নগ্নগাত্রে ধূলোবালিতে খেলা করছে। গৃহকর্তা অতিথির পাশে বসে ভোজন পর্ব সমাধা করেন। গৃহবধূরা পরিবেশন করেন। মোটা চালের ভাত, ডাল, দুটি তরকারী, একটু চাটনি, তার সঙ্গে বাড়ীর গরুর এক বাটি দুধ ও ২।৪ টুকরো পাকা আম। তারপর লেখক লিখেছেন বাড়ীর এই সনাতনপন্থী জীবনযাত্রার মধ্যে একটি আধুনিকতা প্রবেশ করেছে। 'বাড়ীর বড়রা দুইবেলা এক কাপ করে চা খান।' এই উদ্ধৃতির পর ঠাকুর স্বহস্তে লিখেছেন—এই কুলদা প্রসাদ দেবকুমারের মাতামহ। চিঠিটি দেবকুমারের কাছে পাঠিয়ে দিবি।

ঠাকুরের পদধূলি দানের বিবরণ লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ঠাকুরের পা ধুইয়ে দেবার জন্য ঈষদুষ্ণ জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তারকদাদা এই ব্যবস্থাটি দেখে খুশী হলেন। ভোগের জন্য কিছু ফলমূল, বাড়ীর তৈরী মিষ্টি ও পানীয়রূপে ডাবের জল ও গঙ্গাজল রাখা হয়েছিল। ঠাকুর একটু নারকেলের নাড়ু ও গঙ্গাজল গ্রহণ করলেন। তারপর বিদায় নিয়ে পরবর্তী ভক্তগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। পরবর্তী গন্তব্য তপন সরকারের বাড়ী।

বার্ণপুর নিউটাউনের কাছে তপন সরকারদের বিশাল দোতলা বাড়ী। তপন সরকার সেই সময়ে সদানন্দদাদার নির্দেশে 'পথের আলো' পত্রিকায় কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর এক ভক্তশিষ্যের কন্যার সঙ্গে তপনের বিবাহের কথা ভাবছিলেন। ঠাকুর সেই বিষয়ে তপনের বাবা, মা ও সদানন্দ দাদার সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন। তারপর যথারীতি প্রসাদ ইত্যাদি গ্রহণ করে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন। পরবর্তী গন্তব্য মাষ্টারমশায় শচীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ী।

মাষ্টারমশায় শাস্ত্রনিষ্ঠ পণ্ডিত লোক। ঠাকুরের পা ধুইয়ে পুষ্পচন্দন ইত্যাদি দিয়ে যথাবিহিত পূজা করলেন। পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি দিয়ে আরতি করলেন। তারপর সংস্কৃত ভাষায় লেখা স্বরচিত একটি গুরুস্তোত্র পাঠ করলেন।

ঠাকুর এই স্তোত্রটি শুনে খুবই খুশী হলেন। লিখিত স্তোত্রটি মাথার উপর রাখলেন। তারপর সেটিকে হরিসাধনদার হাতে দিয়ে বললেন এটিকে 'জয়গুরু' পত্রিকায় ছাপাবি। প্রসাদ গ্রহণ ও প্রসাদ বিতরণের পর ঠাকুর আবার রওনা হলেন। সেদিনের রাত্রি বাসের আয়োজন আসানসোলে ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে।

আমরা হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত চিত্তে নিজনিজ গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। এইভাবেই আমাদের অভিসার যাত্রা অগ্রসর হতে থাকল।

গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য্য

শ্রী প্রদীপ দাস

অথ মঙ্গলাচরণ ঃ ওঁ তৎসৎ।

বন্দনা ঃ

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
নমামি শিবমদ্বৈতং ব্রহ্মণং বেদপুরুষং॥
বশিষ্ঠাত্রি মথর্ব্বণিং সনৎ কুমার নারদৌ।
বিশ্বামিত্রং সুরগুরুং জমদগ্নিঞ্চ কশ্যপং॥
ভৃগুঞ্চ শুনকং শুক্র শাণ্ডিল্যঞ্চ মহামুনিং।
নমাম্যহং ভরদ্বাজং বাগভ্ভনীং বাচক্নবীং॥
নমামি মহর্ষিং বামদেবং বরেণ্যং।
কৃতেযোহপশ্যদহং ব্রহ্মাস্মীতি তত্ত্বং॥
উপদিষ্টং যেন তত্ত্বমস্যা দিবাক্যং॥
কার্য্যং মৃষা ভবতস্যবিবর্ত্ত মাত্রং।
তৎ কারণং সত্যমেক বাদ্বিতীয়ং॥
নমামি তৎশিষ্যং যাজ্ঞবল্ক্যং মহান্তং।
প্রকটীকৃতং যেন বেদ বেদান্ত শাস্ত্রং॥
নমাম্যহং দধিচীং তথাশ্বলায়ণং।
ব্যাসং শুকং গৌড় গোবিন্দচার্য্য শঙ্করং॥
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।

গুরু শব্দের ধাতুগত ও বর্ণগত অর্থ উপলব্ধি যাহা (১) গুরু = গৃ (বিজ্ঞাপনে শব্দ চ) + কু = উপদেশিক, দেশিক।

অতএব যঃ শিষ্যং রহস্যং ''গারয়তে'' (বিজ্ঞাপয়তি) ইতি গুরু; অর্থাৎ যে শিষ্যের নিকট রহস্য খ্যাপন করে, সে গুরু। অথবা যঃ শিষ্যায় ধর্ম্মং ''গৃণাতি'' (কথয়তি) ইতি গুরুঃ; অর্থাৎ যে শিষ্যের নিকট ধর্ম বলে, সে গুরু।

সদ্গুরু = যে ''সৎ'' পদার্থের উপদেশদেব; যঃ সৎ—সদ্বস্তু, আত্মানং। গৃণাতি কথয়তি, বিজ্ঞাপয়তি। যাবতীয় বস্তুই ''অসৎ'' (অস্থায়ী); একমাত্র আত্মাই ''সৎ'' (সর্বদা স্থায়ী)। সেই আত্মা নামক ''সৎ'' পদার্থের যে উপদেশ দেয়, (গৃণাতি) এবং তাঁহাকে পাইবার উপায় বিজ্ঞাপন করে (গারয়তে) তাহাকেই ''সদ্গুরু'' বলে।

সদ্গুরু ব্রহ্মকোটি, স্বয়ং ভগবান, তাঁহার দেহ ও দেহী অভিন্ন। গুরুগীতাতে সদ্গুরুর যে প্রণাম আছে, তাহাতে তাঁহাকে পূণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) গুরু = গুরু + রু। গু = অজ্ঞান, অন্ধকার, মায়া। রু = জ্ঞান, তেজঃ, ব্রহ্ম।

অতএব যে অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞান দেখ, এবং মায়া ভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্ম প্রকাশ করে, তাহাকে গুরু বলে।

(গুরুগীতায়- ১৭-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

অথ মঙ্গলাচরণমঃ—ওঁ নমো ব্রহ্মাদিভ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায় কর্তৃভ্যে বংশ ঋষিভ্যো নমো গুরুভ্যঃ। বেদবিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যার অপর নাম শ্রুতি। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদ প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বৈদিক সূক্তসমূহ ঋষিদের কণ্ঠে গীত হইত। পিতা পুত্রকে যে স্তোত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন, পুত্র প্রপৌত্রকে সে মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই বৈদিক স্তোত্রসমূহ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এই জন্যই বেদের অপর নাম শ্রুতি। অধ্যয়ন ও জ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। ব্রহ্মবিদ্ গুরু বা আচার্য্য শিষ্যকে প্রথমেই উপদেশ প্রদান করিতেন ''স্বাধ্যয়ো♦ধ্যতব্যঃ''। নিজের সম্প্রদায় বা শাখার বেদ অধ্যয়ন করা উচিত। বেদবিদ্যা অনুশীলনের বস্তু। গুরুপূর্ণিমার দিনে আদিগুরু কে—এ প্রশ্ন অনেকের ভক্তবৃন্দ মনে জাগিয়া ওঠে এবং জাগিয়া ছিল অন্তরে। পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদের ২৬ সূত্রটি হইল—''পূবেষামপি গুরু কালেনা নবচ্ছেদাৎ।''।

সকল অধ্যাত্ম সম্প্রদায়ের সার্বভৌম গুরু ব্যাসদেব। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে স্বয়ং ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—''পূর্বে হি গুরুবঃ কালেন অবচ্ছিদ্যন্তে, যত্রাকচ্ছে পদার্থেন কালোনোপার্বততে স এষ

পূর্বেষামপি গুরুঃ।" ব্যাসদেবের এই সিদ্ধান্ত সকলেরই শিরোধার্য্য। সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও গুরু ঈশ্বর। তিনি সকলের গুরু—ত্রিভুবনের গুরু। ব্রহ্মাদি পূর্ব-পূর্ব গুরুগণ সকলেই কালাধীন অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিমিতায়ুঃ। যাঁহার সম্বন্ধে কাল অনুমাপক হয় না, সেই ঈশ্বর ব্রহ্মাদি গুরু সকলের গুরু। সৃষ্টি মাত্রই কালাধীন, কিন্তু ঈশ্বর কালাধীন নহেন—কালেরও নিয়ন্ত্রা তিনি। সার্বভৌম গুরু; সকল সম্প্রদায়ের আদি গুরু ঈশ্বর। গুরুপূর্ণিমার দিন প্রত্যেক ব্যষ্টি গুরুদেহের মধ্যে স্থিত সেই আদিগুরু পরমেশ্বরেরই গুরুশক্তির বিশেষ প্রকাশ বা বিকাশ হয়। প্রত্যেক গুরুর আশ্রিত শিষ্যগণ তাহাদের দীক্ষাগুরুকে ঐদিন ভক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিলে, সেই আদিগুরুরই পূজা করা হয় এবং তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহ-আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই গুরুপূর্ণিমার দিন সকল সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ নিজ-নিজ গুরুদেহের মধ্যে সেই আদিগুরু ঈশ্বরের কৃপাশক্তির ছোঁয়াচ পাইয়া ধন্য এবং কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্বপ্রথম সৃষ্টিতে আদিতে গুরুশক্তি সমন্বিত গুরুরূপে এই আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই দিনটি গুরুপূর্ণিমা বলে। আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন আবার ব্যাসদেবের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এই পূর্ণিমাকে ব্যাস পূর্ণিমাও বলা হয়। কিন্তু এই তিথিতে ব্যাসদেবের জন্ম হওয়ায়—ইহাকে গুরুপূর্ণিমা তিথি বলা হয় না।

ব্যাসদেবের জন্ম তো দ্বাপর যুগে চতুর্থপাদ বা শেষে হইয়াছে। তাহার পূর্বেও কত যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। সেই সব যুগেও তো গুরুপূজা হইত। সত্য-ত্রেতা ও দ্বাপরের প্রথমপাদ দ্বিতীয়পাদ ও তৃতীয়পাদ এবং যুগে যুগে গুরুপূজা হইত। আদিগুরুর পূজা তো কালাধীন নহে। ঈশ্বর সকল যুগ সকল কল্পে বা কালে এবং সকল কল্পের পূর্বেও বর্তমান ছিলেন আদিগুরু একমাত্র ঈশ্বর, তদ্ভিন্ন সকলগুরু, সকল আচার্য্যই তাঁহার মাধ্যম। ধর্মের দেশ পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। এই পুণ্যপীঠ ধর্ম ও দর্শন চর্চায় পৃথিবীর যে যে কোনও দেশের চেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অবদান রাখে। এইখানেই সৃষ্টি হয়েছে ছয়টি প্রধান আস্তিক দর্শনের এই ষড়দর্শন—(১) সাংখ্য-দর্শন, (২) যোগ-দর্শন, (৩) ন্যায়-দর্শন, (৪) বৈশেষিক-দর্শন, (৫) পূর্ব মীমাংসা-দর্শন, (৬) উত্তর মীমাংসা-দর্শন—ছয়টি দর্শনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবার বহুবাদেরও সৃষ্টি হয়েছে।

(১) অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য (৬৮৬ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম শাম্বর ভাষ্য। (২) বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ—শ্রীরামানুজাচার্য (১০৩৭ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। (৩) দ্বৈতবাদ—শ্রীশ্রীমাধবাচার্য্য (১১৯৯ খ্রীঃ) প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম মাধবভাষ্য। (৪) শুদ্ধদ্বৈতবাদ—অপর নাম ব্রহ্মবাদ শ্রীবল্লভাচার্য্য (১৪০১ খ্রীঃ) প্রমাণিত। (৫) দ্বৈতদ্বৈতবাদ—ইহার অন্য নাম ভেদাভেদবাদ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বারা প্রমাণিত। (৬) অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ—এই মতবাদের প্রবর্তক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গ (১৪৮৬ খ্রীঃ) দ্বারা প্রমাণিত।

এই আদি সমস্ত বাদ মহামহিমায় ওঙ্কারের মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ওঙ্কারের নিকট সমস্ত বাদই নির্বিবাদ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার করুণার প্রার্থনা ও ওঙ্কারের স্তুতিগানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন হিন্দু বা সনাতন ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নানা শাখা বিশিষ্ট। সেই কারণ, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব জটিল ও বিপুল। ছয়টি প্রধান মূলতত্ত্ব। ছয়টি তত্ত্ব—(১) ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডবাদ, (২) অধ্যাত্মবাদ, (৩) কর্মবাদ, (৪) জন্মান্তরবাদ, (৫) মুক্তিবাদ, (৬) ত্যাগবাদ।

এই ছয় মূলতত্ত্ব ঠিক মতবাদ (Doctrine) নহে। যুগে যুগে মতবাদের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এই ছয়তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে না। তাহারা সনাতন সত্য। আধ্যাত্মিক সাধনায় এই পঠে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক বিদ্যমান। তবে যে পথেই ধর্মদর্শন চর্চা করা হোক না কেন প্রতিটি পথ কিন্তু গুরু-আশ্রয়ী। অর্থাৎ গুরুকে স্বীকার ক'রে তার তত্ত্বাবধানেই সব শিক্ষালাভ হয়। গুরুকে অস্বীকার ক'রে সনাতন ধর্মের এমন পথ আমাদের অজ্ঞাত। সুদূর বৈদিক যুগ হইতে অবিচ্ছেদ্য ধারায় গুরু প্রবহমানতা চলছে। গুরু বা আচার্য্যের সাহচর্য্য ব্যতীত কি জাগতিক বিদ্যা কি ব্রহ্মবিদ্যা কিছুই লাভ সম্ভব নয়। গুরুতত্ত্বের মূল ভিত্তিই হল—গুরু একজন আর মানুষ গুরুর মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ। সকলের বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী একমাত্র ঈশ্বর। জীব নহে জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটিতে প্রভেদ আছে।

মূলগুরুসত্ত্বা হইতে ব্যাষ্টিগুরু বা ব্যাষ্টিসত্তার উদ্ভব আবেশে মূল গুরুসত্তার সঙ্গে কোন আচার্য নিজেকে অভিন্ন মনে করিতে পারেন, কিন্তু মূল গুরুসত্ত্বা আচার্য্যের ভিতর দিয়া ক্রিয়া করিয়াও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সকল আচার্য্য বা গুরুই এক ঈশ্বরের প্রকাশ শক্তি। শক্তির মধ্যে প্রকাশের তারতম্য থাকিতে পারে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আচার্য্যের মাধ্যমে উপলব্ধি করিতে হইবে। গুরু শক্তি সঞ্চার করিয়া ঈশ্বর জীবকে ধন্য কৃত-কৃতার্থ করিতে পারে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা আর বাবা।

গুরু এক সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। গুরুশক্তির মূল উৎস ঈশ্বর। ঈশ্বরের শক্তি জীবে অনুপ্রবিষ্ট হয়, মানুষের নহে। গুরুপূর্ণিমার দিনে আদিগুরু ঈশ্বর সত্তাকেই দীক্ষাগুরু বা আচার্য্যের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হয়, ইহাই গুরুশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। আচার্য্য বা গুরু তাহারই প্রকাশ অর্থাৎ পূর্বেষামপি গুরু যেন সেই ঈশ্বরের। গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দীক্ষাগুরুতে আসিগুরু ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। আজ সকল সম্প্রদায়েই দীক্ষাগুরুর মাধ্যম গুরুরও গুরু যিনি সেই ঈশ্বরের পূজা আরাধনা সর্বত্র হইতেছে। গুরুপূজার মাধ্যমে আমরা পরমগুরু ঈশ্বরের পূজা আরাধনা করিতেছি—ইহাই সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকটি নরনারীর বিশ্বাস। সকল সম্প্রদায়কে অনুগ্রহ বিতরণে আজ যিনি ধন্য করিতেছেন, সেই পরম গুরু ঈশ্বরের চরণে কোটি-কোটি প্রণাম, গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদবিদ্যার অনুশীলন আজও অব্যাহত আছে। ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদবিদ্যা সম্প্রদায়াচার্য্যের নিকট হইতে গ্রহণ করাই শাস্ত্রীয় বিধি।

গুরু পরম্পরাকে স্বীকার করাই শিষ্টাচার, না করাই অশিষ্টাচার। নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এইরূপ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ অবগত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি নিমির নিজ পিতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হওয়া যায়। উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পিতা যে স্বীয় পুত্রে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করিতে পারেন—ইহা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পঞ্চদশীতে আছে—''য প্রত্যপভিন্ন পরমাত্মা স এব গুরু''। পাতঞ্জলি ঋষি বলেন—কালেনাপবচ্ছেদাৎ। অর্থাৎ কোনকালে যাকে ব্যধিত করতে পারে না। দেশ-কাল নির্বিশেষে তিনি স্বয়ং প্রকাশ। শুদ্ধ-বুদ্ধ-নির্মাণকায় চিত্ত যার তার মধ্যে ঘটে গুরুত্বের অধিষ্ঠান। গুরু চেতনায় তখন তিনিই হন গুরুত্ববোধে অধিষ্ঠিত গুরু। যিনি আদিগুরু তাঁর ক্রিয়াশক্তিই তার মাধ্যমে কাজ করে। এই-ই হল সার্বভৌম গুরু। গুরুর দেহের ভিতর তার গুরুসত্ত্বা শাশ্বত। এজন্যই বলা হয় গুরুর কোনদিন মৃত্যু নাই গুরু হলেন অখণ্ডমণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত।

গুরুপরম্পরা প্রণাম

নারায়ণং পদ্মভুবৎবশিষ্ঠা
শক্ত্রিংচতৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তর
গোবিন্দ যোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্॥
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমহাস্য পদ্মপাদং চ-
হস্তামলকং চ শিষ্যম্।
তং তোকেং বাকি কারমন্যান
আস্মদ্ গুরুন্ সন্ততমানতো♦স্মি॥

গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণামের ব্যবস্থা শিষ্টাচারসম্মত। ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের আচার্য্য পরম্পরাকে নিজ গুরুপ্রণামের সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম জানাইতে হয়। স্মরণের ভিতর দিয়া কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা হয়। নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর, বেদব্যাস, গৌড়পাদ, গোবিন্দপান্দ, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, পদ্মপাদাচার্য্য, হস্তামলকাচার্য্য, তোটকাচার্য্য ও সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি পরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের আচার্য্য বা গুরু। সকল গুরুকে স্মরণ করিলে সকলেরই আশীর্বাদ ভাজন হওয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের সকল আচার্য্যই আমাদের নমস্য, যেমন স্বীয় গুরু নমস্য, নিজের গুরুকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবনা করিয়া সকল সম্প্রদায়াচার্য্যই নমস্কার জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁর শিষ্য-দর্শনার্থী সন্ন্যাসীর—

শ্রীশঙ্করাচার্য্য

স্বরূপচার্য্য—তীর্থ, আশ্রম।
পদ্মাচার্য্য—বন, অরণ্য।
তোটকাচার্য্য—গিরি, পর্বত, সাগর।
পৃথ্বীধরাচার্য্য—সরস্বতী, ভারতী, পুরী। এরা জ্ঞানমার্গের রক্ষক।

শ্রীশ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালী বা গুরু পরম্পরা—ভক্তিমার্গ। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। এঁরা ভক্তি ধর্মপ্রচার এবং ভক্তিশাস্ত্র রক্ষা করছেন।

শ্রীকাকুস্থ শ্রীরামজী, শ্রীসীতাজী (মতান্তরে শ্রীনারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মী), শ্রীবিষ্কসেনজী, শ্রীশঠ্‌কোপ স্বামীজী, শ্রীনাথ মুনিজী, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুনিজী, শ্রীরামমিশ্রজী, শ্রীযামুনাচার্য্যজী, শ্রীমহাপূর্ণাচার্য্যজী, শ্রীরামানুজাচার্য্যজী, শ্রীকুরেশ স্বামীজী, শ্রীমাধবাচার্য্যজী, শ্রীবোপদেবজী, শ্রীদেবাধিপাদর্বজী, শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যজী, শ্রীগদাধরাচার্য্যজী, শ্রীরামেশ্বরাচার্য্যজী, শ্রীদ্বারানন্দজী, শ্রীদেবানন্দচার্য্যজী, শ্রীশ্রিয়ানন্দাচার্য্যজী, শ্রীমদরাঘবানন্দাচার্য্যজী, জগদ্‌গুরু ভাষ্যকার অনন্তশ্রী বিভূষিত শ্রীমদ রামানন্দচার্য্যজী, শ্রীঅখণ্ডানন্দজী, শ্রীগেসজী, শ্রীপূর্ণ রৈরাটিজী, শ্রীকালুদাসজী, শ্রীগঙ্গাদাসজী, শ্রীবিষ্ণুদাসজী, শ্রীহরভঞ্জনদাসজী, শ্রীঘনশ্যামদাসজী, শ্রীপ্রয়াগদাসজী, শ্রীলক্ষণদাসজী, ভক্তমালী শ্রীরামদাসজী, শ্রীমাধবদাসজী, শ্রীমদ্‌ দামোদরদাসজী, শ্রীমৎ তুলসীদাসজী (শ্রীমদ্‌ দাশরথিদেব যোগেশ্বর) তস্য সেবকাধর্ম, শ্রীসীতারামদাস।

''ওঁ শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথো গুরুর্জয়তি''

বেদান্তবেদ বুদ্ধিসাক্ষী সচ্চিদানন্দরূপী ওঁ শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারস্বরূপ গুরুব্রহ্মকে নমস্কার।

''ওঁকারবাদই সকল বাদের বাদ-বিসম্বাদ একই হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গানপত্য একমাত্র ওঙ্কারের প্রথমে স্ব-স্ব ইষ্ট দেবতারূপে, জ্যোতিরূপে, নাদরূপে, আকাশরূপে লাভ করিয়া চরম ওঙ্কারে একীভূত হন। অদ্বৈতবাদের তো কথাই নাই, কারণ তাহাদের চরম অবলম্বন ওঙ্কার। এমনকি মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণও শব্দবহ্ম ওঙ্কারের উপাসক। তাহাদের কোরান ও বাইবেলে শব্দ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কথিত হইয়াছে। গ্রীক দর্শনেও একই কথা পাওয়া যায়। ভগবান অনন্তদেব যদি তাহার অনন্তবদনে অনন্তকাল ওঙ্কারের স্তুতিগান করেন, তাহলে ওঙ্কারের মহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন না।'' শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ''ব্রহ্মানুসন্ধান'' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

গুরুতত্ত্ব সকলের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। সহস্রদলকমল আদিগুরুরই বসতিস্থান। এখানে পূর্ব্বেষামপি গুরুর নিত্য নিবাস। গুরু একজন এবং তিনি ভগবান। সকল আচার্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার অনুগ্রহশক্তিই কার্য্য করিয়া থাকে। উদ্ধারকর্তা ভগবান। পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদের ২৬ সূত্রে বিষয়টির অর্থাৎ গুরুবাদের অপূর্ব মীমাংসা রহিয়াছে। ব্যাসদেব পাতঞ্জল দর্শনের উক্ত সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন —''পূর্ব্বেহিগুরুবরকালন অবচ্ছিদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছোদার্থেন-কালো নোপাতবর্ততে স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্যমর্গস্যাদৌ প্রকর্টগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিন্বপি প্রত্যেতব্যঃ'' ঈশ্বর সকলের আদিতে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেষ্টা, কারণ তিনিই সকলের আদি, কালশক্তি তাঁহাতে অস্তমিত, ব্রহ্মাদি পূর্বপূর্ব গুরুগণ সকলেই কালাধীন অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল, পরিমিতায়ু। চতুর্ভুজ ব্রহ্মাও জীবকোটিতে বর্তমান, ঈশ্বর কোটিতে নহে। এই জন্যই বহ্মাকে প্রথম জীব বলা হয়। ঈশ্বর ছাড়া সার্বভৌম গুরু আর কেহ নহেন। ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্তা দেবগণেরও জন্ম এবং বিনাশ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্মও নাই, বিনাশও নাই। তিনি অনাদি অনন্ত। তাঁর মধ্যে অনন্তশক্তি বিরাজমান। পরমেশ্বরই সার্বভৌম গুরু এবং তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানের আকর। আদিগুরু হইলেন পরমেশ্বর, কেননা তিনি গুরুগণের গুরু। একমাত্র প্রণবই সেই ঈশ্বরের বাচক। ভগবানের অনুগ্রহশনি লইয়া সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যগণ গুরুশিষ্য পরম্পরা রক্ষা করিয়া থাকেন। বৈদিকযুগে বেদের বহুশাখাই হারিয়ে গেছে শুধুমাত্র পরম্পরার অভাবে। পরম্পরাক্রমে লব্ধ মন্ত্ররহস্য শিষ্যের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশের সাহায্য করে। তাই সম্প্রদায়কে যে কোন মূল্যে রক্ষা করা উচিত। গুরু-পরম্পরাগত আচারের অনুসরণের নামই সম্প্রদায়। জীবোদ্ধার সঙ্কল্প যাঁহার মধ্যে জাগ্রত হয় তিন পূর্ব-পূর্ব গুরুদেরও গুরু—পরমেশ্বর। ঈশ্বরের করুণাই জীবের একমাত্র সম্বল। তাঁহার করুণাপ্রবাহ আজও অপ্রতিহত গতিতে জীবোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী। প্রত্যেক গুরুর ভিতর দিয়া ভগবানের অনুগ্রহশক্তিই ক্রিয়া করিতে থাকে। গুরুর অর্থই হইল মূর্ত অনুগ্রহশক্তি। ব্যাসদেবকে আমরা সার্বভৌম গুরু আখ্যা দিলে ও তাঁহার রচিত ভাষ্যে সার্বভৌম গুরু বলিয়া তিনি কিন্তু একমাত্র পরমেশ্বরকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রণবমন্ত্রে সেই ঈশ্বরের আরাধনার বিধানও দিয়া গিয়াছেন। গুরুবাদের মধ্যে যাহাতে সংকীর্ণতা প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্যই ভাষ্যকার ব্যাসদেব ''পুর্বেষামপি গুরু'' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পরম্পরাক্রমে

নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর, বেদব্যাস, শুক, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ এবং শঙ্করাচার্য্যেরই সন্তান বা শিষ্য-প্রশিষ্য। বিশালবুদ্ধি, উদারহৃদয় ব্যাসদেব সার্বভৌম গুরুবাদের ভিত্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। ''গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে আগত এই শক্তি যিনি লাভ না করিয়াছেন, তিনি যতই শক্তিশালী এবং যতই জ্ঞানী হউনা না কেন, শিষ্যকে মোক্ষমার্গ প্রাপ্তি করাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়কে টিকাইয়া বা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ''গুরুপরম্পরা প্রভাব'' নামক একখানি গ্রন্থে তামিল ভাষায় রামানুজ ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এক আদিগুরু পরমেশ্বর হইতে গুরুশক্তির বিচিত্র প্রবাহ বা ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। সকল ধারায়, শাখায় বা সম্প্রদায়ের ভগবানের এক অনুগ্রহ শক্তির ক্রিয়াই চলিয়াছে।

শ্রীরামানুজ ও শ্রীরামানন্দীয় শ্রীবৈষ্ণব গুরুপরম্পরাঃ—

শ্রীঃ

অস্মদগুরুভ্যো নমঃ, অস্মৎপরমগুরুভ্যো নমঃ, অস্মদ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, অস্মাৎ সর্বগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ, শ্রীপরাঙ্কুশ দাশায় নমঃ, শ্রীযামুনেমুনয়ে নমঃ, শ্রীরাম মিশ্রায় নমঃ, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ, শ্রীমন্নাথ মুনয়ে নমঃ, শ্রীশট্‌কোপায় নমঃ, শ্রীবিস্বকসেনায় নমঃ, শ্রীশ্রিয়ৈঃ নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ।

শ্রীলক্ষ্মীনাথ সমারম্ভাং নাথ যামুন মধ্যমাম অস্মাদ আচার্য্য পর্য্যন্তাংবন্দে গুরুপরম্মরাম। শ্রীগুরুপরম্পরা প্রণাম।

গুরুপরম্পরাক্রমে আগত ধারাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করা সকলের কর্তব্য। বহু ধারা বা প্রবাহ দেখিয়া এক বিরাট শক্তিশালী পরমেশ্বর বা ভগবানের কথাই সকলের মনে জাগ্রত হয়। গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রম স্বীকার না করিলে সনাতন ধর্মের মর্যাদাকেই প্রকারান্তরে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আচার্য্য শঙ্করের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটি প্রধান মঠের আচার্য্য বা মোহন্তগণ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইলেও আদি শঙ্করাচার্য্যকে কেহ ভুলিয়া যায় নাই বা তাঁহার মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ষড়দর্শনের মহর্ষি কপিল প্রণীত—সাংখ্য-দর্শন, মহর্ষি পতঞ্জলি পাতঞ্জল বা যোগদর্শন, অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন, মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব মীমাংসা দর্শন এবং মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন এবং বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য এবং প্রাচীন ভাট্যকারগণের মধ্যে বৌধায়ন, টমক, দ্রামিড়, গুহদেব, কপদী, ভারুকী প্রমুখ আচার্য্যগণ, পরবর্তীকালে শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীনিম্বাকাচার্য্য, শ্রীকমলভাচার্য্য, শ্রীঅযধূতাচার্য্য, শ্রীভাস্করাচার্য্য, শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাঁহারা সব সব মতের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই কারণে বেদান্ত দর্শন নানা মতবাদে বিভক্ত। যথা—কেবলাদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি। বেদান্ত কথিত ব্রহ্ম-জীব-বিশ্ব এই তিন তত্ত্বের যথার্থ নিরূপণে ঐ সকল পূজ্যপাদ আচার্য্যগণদের এবং ব্রহ্মবিদ্যায় উল্লেখ্যডউপদেষ্টা আচার্য্যও ব্রহ্মবিদ্যা বংশ বা আচার্য্যক্রমের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন এইসব বেদান্তবিদ আদি গুরুদের কথা। গুরুই তো গুরুব্রহ্ম অর্থাৎ দীক্ষাচার্য্য মূর্তিস্থ হয়ে জীবোদ্ধার, তাই দীক্ষাচার্য্য মূর্তিতে ঘটে আদিগুরুর আবেশ আর তারই অনুপ্রবেশে—তাতেই আবিষ্ট হয়ে তিনি জগতে গুরুবাসদ গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। এ কারণে বলা যায় দীক্ষাচার্য্যগুরু হলে ''স্বয়ং প্রভের স্বয়ংপ্রভা'' দীক্ষাচার্য্য গুরু ও আদিগুরুকে আমরা অভেদজ্ঞানে একাত্মভাবে আজ গুরুপূর্ণিমার এই পুণ্যতিথিতে স্ব স্ব গুরুর মাধ্যমে আদিগুরু নারায়ণকেই আমরা জানাই আমাদের প্রণাম।

প্রার্থনা

শ্রীঃ

শ্রীভগবতে শঙ্করাচার্য্যায় নমঃ॥
শ্রীভগবতে রামানুজাচার্য্যায় নমঃ॥
শ্রীভগবতে রামানন্দাচার্য্যায় নমঃ॥
''শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ওঁ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথো গুরুর্জয়তি''॥

॥ ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ॥

জীবন খাতার পাতায় পাতায়

শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

(৩)

শুনলাম সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের স্থানীয় মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে পাঠ করতে এসেছিলেন। আমার বাবাও গিয়েছিলেন পাঠ শুনতে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় বাবার সঙ্গে। ঠাকুরের পরিচয়েই তো আমাদের পরিচয়। কথায় কথায় শুনলেন এঁরা ঠাকুরের আশ্রিত। সেদিন অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় বাবা ওঁকে নিয়ে এসেছেন বাড়ীতে।

এরপর থেকে ওঁর আসা-যাওয়া শুরু হল। আমাদের দুটি পরিবারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হল। আমরা জানলাম তিনিও ঠাকুরের শিষ্য, সকলে তাঁকে সোনামণিদা বলে ডাকে, ঠাকুরের দেওয়া নাম সহজানন্দ। বাড়ী ছিল ঠাকুরের গ্রাম ডুমুরদহে। শুনলাম, ঠাকুরের সঙ্গে তিনি বহুদিন কাটিয়েছেন, ঠাকুর অনেক তপস্যা করিয়েছেন। সোনামণিদার আবির্ভাবে কি হল বলি এবার।

ঠাকুর এই দুই পরিবারে আমাদের বাবা মাদের তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই দুই পরিবারে প্রতি সপ্তাহে পালা করে ছেলেদের নামকীর্তন হত বৃহস্পতিবার। পাড়া থেকেও অল্প কয়েকজন আসতেন নামে। তাঁদের সকলেই প্রায় আমাদের গুরুভাই। সোনামণিদা আসায় নামের এবার বান ডেকে গেল। সে যে কি নাম কি বলব! সোনামণিদা একাই একশ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারমোনিয়াম সহযোগে নানা সুরে তাঁর দরদ দিয়ে নামের তুলনা হয় না। তেমনি তেজিয়াল কাজ করা গলা। নাম সন্ধ্যায় শুরু হয়ে কখন যে শেষ হবে তার ঠিক থাকত না। নামের তরঙ্গায়িত অবিরাম স্রোতধারায় সময়ের কথা আমাদের মনেই আসত না। নামের মাঝে তখন সোনামণিদার অবস্থান পরিবর্তন হত যাকে সাধারণভাবে ভাবাবেশ বলা যেতে পারে। এমন অবস্থা কি লোক দেখানো হতে পারে? হয়তো পারে, হয়তো বা পারে না—বলতে পারব না। তবে সে অবস্থাটা তখনও আমার মনে হয়েছিল স্বতস্ফূর্ত, এখনও ভাবলে এইই মনে হয়। সোনামণিদা অঙ্কের শেষভাগে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কথা লোকমুখে কানে আসে তবে সোনামণিদার নামের ক্ষমতা বা সোনামণিদা fraud এমন কথা কানে আসেনি। লোকমুখে যা শুনেছিলাম এবং ঠাকুরের শ্রীমুখে যা শুনেছিলাম যথাসময়ে বলব। তবে অসাধারণ নাম করার ক্ষমতা তাঁর ছিল এ কথা অনস্বীকার্য।

পরবর্তী পর্যায়ে এই চাতরায় গুরুভাইদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে নাম হতে লাগল তারপর প্রকৃত অর্থে নামের প্লাবন এসে গেল আমাদের বাড়ীতে। এখন সেদিনের কথা ভাবলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই। এবার নামের প্লাবনে দিনরাতের ব্যবধান বোধহয় মুছে গেল—সারাদিন রাত নাম, মাঝে মাঝে বিরতি প্রাত্যহিক কাজকর্মের জন্য। কতদিন যে সারারাত নামকীর্তন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মূলে সেই প্রত্যক্ষভাবে সোনামণিদা। নামের ঝঙ্কারে বাড়ীর আকাশ-বাতাস সতত ঝঙ্কৃত যখন নামের বিরতি তখন ঠাকুরকতা। ঠাকুরের যে কত কথাই বলতেন! সেই পুরানো দিনের কথা। সোনামণিদাকে দেখেছি বেশ আবেগপ্রবণ মানুষ। যখন আবেগ দিয়ে ঠাকুরেরর কথা বলতেন শুনতে কি ভালোই যে লাগত। শুধু নামের মধ্যেই নয় ঠাকুরের কথাতেও সোনামণিদার চোখ দিয়ে জল ঝরতে দেখেছি। অথচ এই সোমানণিদাই কথা প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে বলতেন যে তিনি ঠাকুরের সঙ্গ ছেড়ে এসেছেন কারণ তাঁর পথ আলাদা, সন্ন্যাস নিয়েছেন আরও কঠোর সাধনা করতে হবে। তখন সোনামণিদার এসব কথা বুঝতাম না। তাঁর নাম ও ঠাকুরকথা আমাদের খুব টানতো। অনেক একাদশীতে সোনামণিদা আমাদের সকলকে উদয়-অস্ত মৌন পালন করাতেন, নিজেও আমাদের সঙ্গে মৌন থাকতেন। সন্ধ্যায় মৌন ভঙ্গ করে নামকীর্তন হত। এই সোনামণিদা বলেছিলেন দেখো একদিন এ বাড়ীতে

ঠাকুরের অনেক লীলা হবে একদিন, তবে তখন সোনামণিদা থাকবে না। সেদিন আমরা ভাবতেও পারতাম না যে ঠাকুর কোনওদিন এ বাড়ীতে কৃপা করে আসতে পারেন। তাই সোনামণিদার কথায় আমরা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলতাম—'কি যে বলেন দাদা, ঠাকুর এখানে আসবেন।' সোনামণিদা উত্তরে বলতেন---'এখন তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না তো, কথাটা সেদিন মিলিয়ে নিও। একবার নয় ঠাকুর এখানে অনেকবারই আসবেন। এখন এসব ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ চলেছে। পরবর্তীকালে সোনামণিদার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

এই নাম-প্লাবনের মধ্যেই আমার পড়াশুনা চলছিল। এরই মধ্যে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা এল-গেল, পরীক্ষা দিলাম বাণিজ্য বিভাগে, পরীক্ষার ফলও বেরুল। পাড়াঘরে যখন সকলের ধারণা হয়ে গিয়েছে যে এই দিনরাত 'হইহট্টগোল' এর মধ্যে আমার পরীক্ষা পাশ দুরুহ হবে এবং এতদিনের 'স্কুলে ভাল ছাত্র' নামে কালি পড়বে তখন তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ করে ঠাকুরের কৃপায় অত্যন্ত ভাল ফল হল আমার। সেটা ইংরাজীর ১৯৬৩ সাল। ঐ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নামরূপে নামীর যে সূক্ষ্মলীলা সেদিন হয়েছিল তার ফলে বাড়ীতে দিবারাত্র নামকীর্তন হওয়ার যে তীব্র সমালোচনার ঝড় পাড়াঘরে বইছিল তা এবার বন্ধ হল। কিন্তু ঠাকুরের এমন লীলা যে বইয়ের ঝড় বন্ধ হলেও আর এক নতুন ঝড় বইতে শুরু করল। সে ঝড় শরিকী বাড়ীর অন্দর মহলে।

আমার সেজ জ্যাঠামশাই সরবে প্রতিবাদ শুরু করলেন। বাড়ীতে এইভাবে ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়ে দিন নেই রাত নেই, সময় অসময় নেই, যখন তখন নাম করা নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করলেন। ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদের ঝড় তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। ঠাকুরের গোষ্ঠীতে আমরা তখন নতুন। ঠাকুরের সঙ্গ ছেড়ে গেরুয়া নিয়ে সোনামণিদার বেরিয়ে আসার যেমন অত বুঝিনি আমার সেজ জ্যাঠামশায়ের প্রতিবাদও ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। তাঁর সরব-উষ্মা সেসময় আমাদের কাছে নামের ওপর আঘাত বলেই মনে হয়েছিল। আমাদের দুই পরিবার (অর্থাৎ আমাদের ও শ্রীমান অশোকদের) দৃঢ়ভাবে সোনামণিদার সঙ্গে থেকে নামকে আঁকড়ে ধরলাম। সুতরাং একদিকে যেমন বাড়ীর মধ্যে প্রতিবাদ, চিৎকার, চেঁচামেচি চলতে লাগল তেমনি অন্যদিকে নামকীর্তনও চলতে লাগল উত্তাল তরঙ্গে। তখন আমাদের বয়স কম, ঠাকুরের নীতি নিয়ম তেমন কিছু জানতাম না। এখন পরিণত বয়সে মনে হয় আমাদের সেজ জ্যাঠামশায়ের প্রতিবাদে কিছু সারবত্তা ছিল। তাঁর আপত্তি নাম সম্বন্ধে হয়তো তেমন ছিল না যেমন ছিল ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে নাম করা নিয়ে।

যদি কোনও সহৃদয় পাঠক তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে এই লেখাটি পড়েন তবে তাঁকে অনুরোধ করব আর একটু ধৈর্য্য ধরে আর একটু সময় নষ্ট করে এটি পড়ে চলুন, সোনামণিদার পর্ব শেষ করার আগে ঘটনাটির ওপর ছোট একটি বিশ্লেষণী ইচ্ছা রইল আমার অল্পবুদ্ধির, যা মনে হয়েছে। এবার ঘটনার ঘটমান ধারায় ফিরি।

বাড়ীতে নাম চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলেছে সময়ের স্রোত। এরই মধ্যে ঠাকুরের কাছে বেশ কয়েকবার আমাদের দুই পরিবারের যাওয়া হয়েছে। পুষ্করেও যাওয়া হয়েছে, সেখানকার স্মৃতিকথার কিছু কথকতা আগেই করা হয়েছে। ঠাকুর কৃপা করে এই দুইভাইকে (জয়ন্ত, অশোক) কাছে টেনেছেন, ভালবেসেছেন, বহুজনের মধ্যে নামে চিনেছেন তাঁর শ্রীরামপুরের দুই ছেলে বলে, আমাদের বাবা-মাদের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত করেছেন। জোয়ারের টানের পর যেমন নদীতে আসে ভাটার টান, তেমন সোনামণিদাকে নিমিত্ত করে যে নামের জোয়ার চাতরায় এসেছিল একসময় সেই জোয়ার এবার স্তিমিত হয়ে এলো ভাটার টানে। সোনামণিদা তখনও আসছেন, তবে তাঁরও আর আগের মতো জৌলুস নেই, অনেকটা নিস্তেজ নিষ্প্রভ তিনি, যেন উজ্জ্বলতা হারানো মালিন্যের ছোপধরা চাঁদ। এইসময় ঘটনার ধারা হঠাৎ একটি বাঁক নিল।

(ক্রমশঃ)

ভক্তপ্রিয় জগন্নাথ

অতৃণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজগন্নাথ, প্রভু জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ—নানা নামের জয়ধ্বনিতে মুখরিত মন্দিরের সম্মুখ। লাখো ভক্ত অপেক্ষমান, অপেক্ষায় রয়েছে তিনটি সুসজ্জিত রথ। বড় রাস্তা জুড়ে হাজারো পুলিশ নিরাপত্তার কাজে ব্যস্ত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন ভক্তরা। দুচোখ ভরে দেখতে চান প্রভুকে। অগণিত কাঁসর বাজছে। কেউ নৃত্য করছে। সবত্রই এক অনাবিল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। শতক, হাজারো অসুবিধাকে দূরে ঠেলে যে একবার এখানে আসতে পেরেছে সেই এই আনন্দের সাথী হচ্ছে। যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো অনাবিল এক আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভক্তদের উপর। এই আনন্দের মাঝেই কখনও আকাশ থেকে হচ্ছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। আনন্দসিক্ত লক্ষ চোখ সেই মন্দিরের দরজায়। প্রভু আসছেন, শুধু নিজে নয়, দাদা বলভদ্র, বোন সুভদ্রা আর সুদর্শনকে সঙ্গে নিয়ে।

ভক্তের আকুল প্রার্থনায় আজও প্রভু জগন্নাথ রথের দিন তাঁর লক্ষ নারায়ণ শিলার রত্নবেদী ছেড়ে নেমে আসেন ভক্তের মাঝে। ওঠেন নবনির্মিত রথে। সুউচ্চ রথ থেকেই তিনি তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তদের দর্শন দেন। সর্বধর্মের মানুষজনের আনন্দে রশি টেনে প্রভুকে নিয়ে চলেন মাসির বাড়ী বা গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে। যাত্রার প্রথমে চলে দেবী সুভদ্রার রথ, 'দেবী রথ' বা 'দেবী দলন' নামের ১২টি চাকা বিশিষ্ট এই রথে দেবী সুভদ্রার সঙ্গেই থাকে সুদর্শন বিগ্রহ। এই রথের সারথি অর্জুন, লাল রঙের চারটি ঘোড়া, রোচিকা, মোচিকা, জিতা ও অপরাজিত (অপর একটি মতে ঘোড়াগুলি হল প্রজ্ঞা, অনুজ্ঞা, ঘোরা ও অঘোরা)। এর ১৪টি চাকা বিশিষ্ট তালধ্বজ নামে রথে ওঠেন বলভদ্রদেব। সাদা রঙের তীব্রা, ঘোরা, দীর্ঘাশ্রমা ও স্বর্ণভা (অন্য মতে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব)। সারথি মাতলি। সর্বশেষ মন্দির থেকে বেড়িয়ে আসেন প্রভু জগন্নাথ। ওঠেন জগন্নাথের ১৬ চাকাবিশিষ্ট রথ নন্দী ঘোষে। কালো রঙের ঘোড়া শঙ্কা, বালহক, শ্বেত ও হরিদাশ্ব (অন্য মতে শঙ্খিনী, রোষিকা, মোতিকা, জ্বালিনী)। সারথি দারুক। মাথায় পরা থাকে শোলা, ফুল, তুলসী দিয়ে তৈরী বিশেষ মুকুট 'টায়হা', ১০০৮টি দুর্বা দিয়ে তৈরী অর্ঘ্য বাঁধা থাকে এই মুকুটের মাথায়। দয়িতাপ্রতিরা ধীরে ধীরে নিলাদ্রী কন্দর থেকে বাইশটি সিঁড়ি দিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন প্রভুকে। এই 'পাহাণ্ডি'র শেষে তিনি নন্দিঘোষ নামের রথে আসীন হন। এই রথে থাকে প্রভুর দারুবিগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রতিনিধি, রূপোর মদনমোহন বিগ্রহ, বলভদ্রের রথে থাকেন সেইরকম রামকৃষ্ণ।

জগন্নাথ প্রভুর প্রধান সেবক পুরীর রাজা। তিনিই প্রথম রথে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রথ মার্জনা করেন। যাকে স্থানীয়রা বলে 'ছেঁড়া পহারা'। তারপরই রথের যাত্রা শুরু হয়। প্রভু চলেন গুণ্ডিচা মন্দিরে। এই মন্দিরেই দেব বিশ্বকর্মা প্রথম সমুদ্রে ভেসে আসা নিমকাঠ দিয়ে তৈরী করেছিলেন এই অপার্থিব শ্রীবিগ্রহ তিনটি। গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রভুর যাত্রা, নয়দিন অবস্থান করে গুণ্ডিচা মন্দিরের মহিমাকে প্রভু জগৎবাসীর কাছে তুলে ধরেন। তিনি রত্নবেদী ছেড়ে এই মন্দিরে তিনি অবস্থান করেন 'যজ্ঞবেদীতে'। এখানেই তিনি বছরের এই ক'দিন ছাপান্ন ভোগ গ্রহণ করে সেবকদের কৃতার্থ করেন, আর নয়দিন পর আবার নিলাদ্রি বিজয়যাত্রা করে ফিরে যান নিজের শ্রীমন্দিরে, যেখানে মা লক্ষ্মী, দেবী বিমলা অপেক্ষা করে থাকেন। ফিরে যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় প্রভু সোনাবেশে সেজে উঠে ভক্তদের দর্শন দেন। সোনার মুকুট, সোনার দুটি হাত, সোনার পদযুগল গ্রহণ করে অপূর্ব এক

মোহনরূপ ধারণ করেন জগৎপতি শ্রীজগন্নাথ। কথায় বলে একশ ভরি সোনার গহনায় সেইদিন ত্রিমূর্তি সেজে ওঠেন। লক্ষ লক্ষ ভক্ত ধন্য হন এই সোমাবেশ দেখে। এরপর তিনি লক্ষ্মীদেবীর মানভঞ্জন করে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন নিজের মন্দিরে। স্নান যাত্রার তিনি বেদী থেকে নেমে আসেন, আর রথের শেষে তিনি পুনরায় রত্নবেদীতে ফিরে যান, এইসময় শবরজাতি গোষ্ঠির দয়িতাপতিরা প্রভুর মুখ্যসেবকের ভূমিকা পালন করে। স্নানের পর প্রভু অসুস্থ হয়ে পড়লে বৈজ্যরাজের ওষুধ আর বিশ্ববসুর আন্তরিক সেবায় প্রভু ফিরে পান নবযৌবন। একপক্ষকাল অন্তরালে অবস্থানের শেষে ভক্তদের প্রার্থনায় রথারূঢ় হন।

সারা বছরে শ্রীজগন্নাথের বারটি যাত্রা। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দোলের পর পর্য্যন্ত কখনো চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, শয়নযাত্রা কিংবা চৈত্রমাসের দমোনক যাত্রা প্রভৃতি নানা যাত্রা করেন সারাবছর ধরে। এরই মধ্যে শারদীয়া দুর্গাপূজা ও বাসন্তি পূজার (নবরাত্রীতে) সময় জগন্নাথের প্রতিনিধি দুর্গামাধব দেবী বিমলার মন্দিরে যাত্রা করে অবস্থান করেন। তবে তাঁর স্নানযাত্রা ও রথযাত্রাই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, পরিচিত ও জনপ্রিয় ভক্তদের কাছে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা পুরীধামে আসেন এই যাত্রায় অংশ নিতে। সমুদ্রবেষ্টিত পুরী, পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শুরু হয় রথ তৈরীর কাজ বিশেষ পূজা ও হোম যজ্ঞ করে। প্রতিবছরই নতুন করে তিনটি রথ নির্মাণ করা হয়। এই রথ তৈরী হয় মূলত কাঠ দিয়ে। এছাড়াও তিনটি রথ সুদৃশ্য কাপড়ে ঢাকা থাকে। রথ তিনটি রঙ্গীন ও বর্ণময় হয়ে ওঠে। ফুলের তোরণ দিয়ে সাজিয়ে আরও রথকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এইসব কাজ বংশ পরম্পরা অনুযায়ী অন্তজ শ্রেণীর নির্দিষ্ট সেবকরাই প্রতিবছর করে থাকে অতি নিষ্ঠা সহকারে।

প্রভু জগন্নাথ বিভিন্ন ভক্তের কাছে এক একরূপে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। স্নান যাত্রার দিন সন্ধ্যায় গণেশ রূপ ধারণ করেন। গজবেশে সেজে তিনি হয়ে ওঠেন গজানন। দেবী বিমলা সতীর ৫১ পীঠের একটি অন্যতম পীঠ। দেবীর নাভি পড়ায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্র শক্তিপীঠও বটে। দেবীর ভৈরব এখানে স্বয়ং জগন্নাথ। তাই শাস্ত্র বলছে 'বিমলা ভৈরবী যত্র জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ।' জগন্নাথ শুধু শিব নন, তিনি নারয়ণও। তাই প্রভুর এই বিচিত্র লীলা প্রসঙ্গে উড়িষ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীকাহ্নুচরণ মিশ্র লিখেছেন, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য জগন্নাথ মন্দিরে পঞ্চরাত্রি পূজা প্রচলন করা ও চতুর্ব্যুহ পদ্ধতিতে বিগ্রহের নামকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় বাসুদেবরূপী জগন্নাথের জ্ঞানশক্তিকে বলভদ্র, ইচ্ছাশক্তিকে সুভদ্রা ও ক্রিয়াশক্তিকে সুদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্যুহবাদের আরোপ এ স্থলে এ দৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানশক্তি মহত্ব ও তত্ত্বরূপী সঙ্কর্ষণ—বলভদ্র
ইচ্ছাশক্তি অহং তত্ত্বরূপ—সুভদ্রা
ক্রিয়াশক্তি মনস্তাত্ত্বাত্মক—সুদর্শন।

'ব্রহ্মপুরাণ' দ্বারা সমর্থিত এই ব্যাখ্যা অনুসারে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন এই চতুর্ধামূর্তি যথাক্রমে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রতীকরূপে বিদ্যমান, কিন্তু রত্নবেদীতে এই চতুর্ধামূর্তির উপবেশন ও স্থাপনের, ধারার সহিত চতুর্ব্যূহ বর্ণিত উপস্থাপনের ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ এক্ষেত্রে দেবতারা বলভদ্র, সুভদ্রা, জগন্নাথ ও সুদর্শনরূপে উপবিষ্ট। চতুর্ব্যূহ মধ্য হইতে একটি ব্যূহ ও সুভদ্রার ন্যায় নারীমূর্তি নহে। তাহা হইলে পঞ্চরাত্রি আগমের সমর্থকগণ ইহাকে (সুভদ্রা) কিরূপে এক পুরুষ বিগ্রহ চিন্তা করতে পারলেন এবং এক প্রতীক বিগ্রহ সুদর্শনকে অনিরুদ্ধ ব্যূহরূপে সমর্থন করিলেন তাহা অনুধ্যানের বিষয়, আমাদের মনে হয় এ মূর্তি প্রণবমূর্তি। বেদ ও উপনিষদে বর্ণিত প্রণবের চারিমাত্রা ও ব্রহ্মের চারিপাদ। পরবর্তী অধ্যায় ধ্যান; প্রণব মন্ত্র তাহাকে আশ্রয় করিয়া রূপলাভ করিয়াছে। যা পাদ তাই মাত্রা—সুতরাং 'যথার্থ মাণ্ডুক্য উপনিষদ' কহিয়াছেন—'সোয়মাত্মাধ্যক্ষের মোঙ্কারোধি মাত্রাঃ। পাদাঃ মাত্রাঃ মাত্রাশ্চ পাদাঃ আকার-উকার-মকার ইতি।'

সুতরাং ইহারা আবার ওঙ্কাররূপী; দার্শনিক ও ভক্ত অচ্যুতানন্দ এই পার্থিব মূর্তিকে বর্ণনা করেছে 'ওঙ্কাররূপে'।

প্রভু জগন্নাথকে তাঁর শ্রীমন্দিরে সারাদিনে পূজারীরা প্রথমে গোপাল মন্ত্রে পূজা করেন। মধ্যাহ্নে তিনি কৃষ্ণরূপে পূজিত। সন্ধ্যায় তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে পূজা গ্রহণ করেন। সারাদিন ৫৬ রকম ব্যঞ্জনে চলে প্রভুর সেবা। চারধামের মধ্যে পুরুষোত্তম ধামে প্রভুর ভোজন সম্পন্ন হয়। তাই সকালে বাল্যভোগ দিয়ে যে সেবা শুরু হয় রাতে শয়নের আগে পান্তা ভাত দিয়ে তা শেষ হয়। নিত্যদিন জগন্নাথদেব-এর ভোগের থালাটি বিমলা মন্দিরে দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। দেবী বিমলা সেই ভোগ গ্রহণ করার পরই তা হয় মহাপ্রসাদে পরিণত। সব মন্দিরে দেবতা ভোগপ্রসাদ বলে পরিচিত হলেও শুধুমাত্র শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের প্রসাদই একমাত্র 'মহাপ্রসাদ'। এই প্রসাদ নিত্য গ্রহণে ভক্তিলাভ হয়। প্রভুর প্রসন্নতার মিশ্রিত এই মহাপ্রসাদ ভক্তকে পবিত্রতা ও অপার্থিব শান্তি দান করে।

স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা প্রতিবছর জগন্নাথদেব ১৫দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। আগামী বছর আষাঢ় মাসে হবে জোড়া অমাবস্যা। তাই এই মাস মলমাস রূপে ধরা হবে। স্থানীয় ভাষায় এই মলমাসকে 'অধিমাস' বা 'পুরুষোত্তম মাস'ও বলা হয়। লৌকিক প্রথায় এই মলমাসে কোন শুভ কাজ হয় না কিন্তু শাস্ত্র ও স্মৃতিসমূহ পরার্থ সিদ্ধির জন্য অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই আগামী বছর স্নানযাত্রার পর প্রভুর নতুন মূর্তি তৈরী হবে 'নবকলেবর'। বর্তমান শ্রীবিগ্রহ থেকে 'ব্রহ্মবস্তু' নতুন বিগ্রহ স্থাপনের মধ্যে দিয়েই হবে নবকলেবর অনুষ্ঠান। প্রভুর নির্দিষ্ট প্রথা মেনেই সম্পন্ন করেন দয়িতাপতিরা। বর্তমান বছরের চৈত্রমাসের দর্শমীর দিন পুরীর গজপতি মহারাজার আদেশ নিয়ে এই শুভকার্য শুরু হবে। ওইদিনই মন্দির থেকে প্রভুর আজ্ঞা প্রদান করা হবে। তারপরই শুরু হবে নতুন করে দারু সংগ্রহের কাজ। বর্তমান শতাব্দীর এইটিই প্রথম নবকলেবর অনুষ্ঠিত হবে। এই কাজের জন্য স্নানযাত্রার পর ১৫দিনের পরিবর্তে পঁয়তাল্লিশ দিন মন্দির বন্ধ থাকবে। এই সময় বর্তমান মন্দির সংলগ্ন কৈলিবৈকুণ্ঠেই প্রভুর জীর্ণ দারুমূর্তি সমাহিত করা হবে নয় হাত গভীর গর্তে। তারপর তা মাটি চাপা দিয়ে লাল সিল্কের বস্ত্রে ঢেকে দেওয়া হবে। নতুন বিগ্রহ তৈরীর সূচনা থেকেই চলে বিশেষ পূজাপাঠ। যজ্ঞ ও মন্ত্রজপের অনুষ্ঠান। মন্দিরের ভিতর সমগ্র অনুষ্ঠানই হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিশেষ আজ্ঞাপ্রাপ্ত দয়িতাপতিগণ এই কার্য্য সমাধা করেন। ১৯৯৭ সালের পর ২০১৫ সালে এই নবকলেবর উপলক্ষ্যে এখন থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি। ওড়িষা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রচুর অর্থ খরচ করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পুরী শহরকে। আগামী বছর নবকলেবর উৎসব উপলক্ষে পুরীতে যে বিপুল ভক্ত সমাবেশ হবে তাদের যথাযথ পরিষেবা দেওয়ার জন্যই সরকারী স্তরে প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। তাই আগামী রথযাত্রার সময় নতুন শ্রীবিগ্রহ সর্বপ্রথম ভক্ত সাধারণের সামনে উপস্থিত হবে। আবার ভক্তপ্রিয় জগন্নাথ তাঁর দুটি হাত প্রসারিত করে আহ্বান করবেন ভক্তদের। তাঁর অপলক কৃপার দৃষ্টিতে ধন্য হবে ভক্তজন। পূর্ণ হবে ভক্ত ও ভগবানের মিলনের শ্বাশত মিলনক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম।

একটি বিরল মহাপ্রয়াণ মহোৎসব

কিঙ্কর সমীরণ

সকাল বেলাতে হঠাৎ ভেসে এল—'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে...।' শুনছিলাম। একসময় সিট ছেড়ে উঠে মনে মনে প্রার্থনা জানালাম—পুষ্পাঞ্জলিটা তুমি গ্রহণ করো ঠাকুর।

ওঙ্কারেশ্বর থেকে ফোন এল। লেখা চলছে? —হ্যাঁ, আশীর্বাদ করুন। —'তৎকাল হোক, আজকাল হোক, টিকিট কেটে অযোধ্যায় চলে এস। আমি বাইশ তারিখে ঢুকছি। চিন্তা করো না। ঠাকুর তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।' বললাম—প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। উনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

২৪শে জুলাই আমাদের সদ্য প্রয়াত আচার্য্য কিঙ্কর বিদ্যানন্দজীর (ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী) মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে সাধু-ভাণ্ডারা, তার আগে আদ্যশ্রাদ্ধ'র কাজ হয়ে গেছে। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ, কিংকর বিরাগানন্দজী, শ্রী করুণাময় সেনশর্মা, কানপুরের শ্রী অমল নিয়োগী, শ্রী অশোক বাজপেয়ী, সুবোধ জেটলি, মহামিলন মঠের শীল দা, শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, সারা ভারত ওঙ্কারনাথ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, ওদিকে তেতেরিয়া ঠাকুরবাড়ী থেকে শ্রী সুধীর মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন দুই পুত্রসহ শ্রীমতী ঊষাদেবী। ইনি কিংকর বিদ্যানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ঊষা মায়ের ছেলেরা রামজীর সামনের দালানটিকে ফুল এবং রঙীন ফ্লেক্স দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। অপূর্ব সুন্দর করে সাধু মহাত্মাদের বসার জায়গা সাজান হয়েছিল। শুনলাম মহারাজ ওদের দুইভাইকে দীক্ষাদান করে অযোধ্যায় ওঙ্কারনাথ মিশনের সাংগঠনিক কাজের ভার দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিদ্যানন্দজী ও বিঠ্ঠলজীর সব ছবি দিয়ে যেভাবে ফ্লেক্সগুলোর ডিজাইন করা হয়েছিল তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

সকাল ৯টার পর দূরদূরান্ত থেকে সাধু মহাত্মারা আসতে আরম্ভ করলেন। ওঙ্কারেশ্বর থেকে এসেছিলেন কিঙ্কর স্বরূপানন্দজী। সাধু-ভাণ্ডারার একজন বিশেষজ্ঞ। সব ব্যাপারেই নিখুঁত ব্যবস্থা। প্রায় দেড়শোজন সাধু আর দেড়শোজন আশ্রমিক ব্রাহ্মণ। সাধু-আপ্যায়ণে যেন কোনোরকম ত্রুটি না হয় সেদিকে বিঠ্ঠলজীর সতর্ক দৃষ্টি। প্রথমেই বহুসহস্র টাকার বাসন কেনা হল। সব তো চুরি হয়ে গেছিল।

শ্রীরামজীর বিগ্রহের সামনেই শ্রীনামের মঞ্চ। সকাল থেকেই শ্রীনাম নৃত্য করছেন। ছোট ছাউনির, আমাদের রামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রধান নিত্যগোপাল দাসজী এসে পৌঁছুতে পারেননি বলে ভাণ্ডারা শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছে। কিন্তু কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। মেদিনীপুর থেকে এসেছেন শ্রীনামকারীর দল। কাঁথি থেকে মদন জানা, পূর্ণদা এসেছেন কেশিয়াড়ী থেকে, কানাই মাইতি, পাঁচুদা। মদনদা অপূর্ব নাম করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই মদন দা'র বিয়ে দিয়েছিলেন শিবকালী আশ্রমে। অপূর্ব নাম হচ্ছে। সবাই যেন সেই নামের জাহাজেই বসে আছেন। পরম নিশ্চিন্তে নাম শুনছেন, ভাবটা হল—লক্ষ্য তো স্থির হয়েই গেছে, আর তো উপায়ও ঠিক। কোন ভয় নেই, গা এলিয়ে দিয়ে শীতের গাভীনের মত শ্রীনামের তাপ নিচ্ছে সবাই, এলেন ফলাহারী বাবা যোগীরাজ মহাবিদ্যালয়ের মঠ সঞ্চালক, শ্রীকৃষ্ণকান্ত আচারিয়া (চন্দ্রহারী মন্দির) রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচারী। এলেন শ্রীরাম হর্ষণ কুঞ্জ মঠের উত্তরাধিকারী। উত্তর তোতাদ্রী মঠের অনন্ত আচার্য্যী, রামানুজ সম্প্রদায়ের উত্তর ভারতের আচার্য্য। হনুমত সদনের মহাত্মারা এলেন। লেখক তো সকলকে চেনেন না। ফলে সকলের নাম উল্লেখ করা গেল না। এই সব সাধুমূর্তির কি দৃষ্টিনন্দন শোভা! একসঙ্গে এত সাধু মহাত্মাকে দর্শন করা,

এরকম বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া একমাত্র শ্রীগুরুকৃপাতেই সম্ভব। সবাই অপেক্ষা করছিলেন নিত্যগোপাল দাসজীর জন্যে। একটু বাদেই জনৈক সেবক এসে সংবাদ দিলেন উনি আসছেন। ছোট ছাউনিতে প্রায় আড়াইশো দীক্ষার্থী রয়েছে। দীক্ষাদান সম্পূর্ণ করেই আসছেন। আপনারা ভাণ্ডারা শুরু করুন—উনি অনুরোধ করেছেন।

শ্রীনাম এবার একটু ছোট হলেন। পশ্চিমদিকের মঞ্চে আগত মহাত্মাগণ আসন নিয়েছেন। উত্তরমুখী হয়ে আমাদের অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সাধুমূর্তিরা আসন নিয়েছেন। মঞ্চ আলো করে বসে আছেন কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ। সর্বাধীশ অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়। কিংকর বিরাগানন্দজী, সৌম্যমূর্তি, এ.বি.জে.এস-এর ট্রাস্টির সদস্য, তেতেরিয়া বাড়ীর শ্রীসুধীর মহারাজ, ভীড় বেশ বেড়ে চলেছে।

শ্রীমৎ বিঠ্ঠলজী আগত সকল সাধু মহাত্মাদের স্বাগত জানালেন। আন্তরিক প্রণাম নিবেদন করলেন। কিঙ্কর গোবিন্দদাসজীকে (চক্রপাণিজী) শ্রীরাম-জানকী মন্দিরের অধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করা হয়েছে ঘোষণা করলেন। ঘোষণার সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই হর্ষধ্বনি করে সাধু সমাজ কিংকর গোবিন্দজীকে বরণ করে নিলেন। বিঠ্ঠলজীর এই সিদ্ধান্তে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিংকর সামানন্দজীরও দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল চক্রপাণির প্রতি। আটটি ভাষা জানেন। আনন্দময় মূর্তি। দুটি বিষয়ে এম.এ.। সঙ্গীত সহকারে নিয়মিত ভাগবত প্রবচন করেন। জন্মসূত্রে নেপালী। কি অদ্ভুত জীবন! একটা সময় ছিল দুটি অন্নের জন্যে আজকে এ আশ্রম কাল ও আশ্রম ঘুরে বেড়াতেন। একদিন বিদ্যানন্দজীকে ধরে বসলেন। পাণিগ্রাহীদা বলেছিলেন আমার ঠাকুরের নিয়ম হচ্ছে কেউ যদি দু'মুঠো অন্ন চায় তাকে দু'মুঠো অন্ন দিতেই হবে। সেই থেকে চক্রপাণি শ্রীরাম-জানকী মন্দিরে স্থান পেয়ে গেলেন। শ্রীরামজীর সেবা অর্চনা আর প্রসাদ---এই তার নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ল।

বিঠ্ঠলজী মাল্যভূষিত করলেন চক্রপাণিকে। উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন। সমস্ত মহাত্মাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে বললেন। পূর্ণ যুবক। আঠাশ-তিরিশ বয়স হবে। প্রচণ্ড ছোটাছুটি করতে পারেন। সাধু ভাণ্ডারাতে যোগ দেবার জন্য ওই সকলকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল। সাধুমহলে ভালই পরিচিতি আছে। একবার রান্না, একবার আপ্যায়ণ, আবার সাথে সাথে পরিবেশন।

কেবল ভাবছি আজকের এই মহতী সমাবেশে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীঠাকুর পাণিগ্রাহীদাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। নিশ্চয়ই উপস্থিত আছেন। নইলে এত লোকের চোখেমুখে আনন্দ টলমল করছে কি করে? ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কী করে দেখবো? সেই দেখবার চোখ কোথায়? এই চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে কি সাধু দেখা যায়, না, শ্রীশ্রীঠাকুরের সূক্ষ্মরূপকে ধরা যায়? গীতায় তো শ্রীভগবান বলছেন—

'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।
১১।৮

হে গুরুদেব আমার এই প্রাকৃত নয়নের দ্বারা তোমার অপ্রাকৃত রূপ তো আমি দর্শন করতে পারবো না, তার জন্যে তোমাকে কৃপা করে আমায় সেই চোখ দিতে হবে যাতে আমি তোমার রূপ-লীলা দর্শন করতে পারি।

হঠাৎ একটা আওয়াজ উঠল। তাকিয়ে দেখি এক বিশাল সাধুমূর্তি, সঙ্গে স্টেনগানধারী নিরাপত্তা রক্ষী। অনেকটা দ্বারকা পীঠাধীশ শঙ্করাচার্যের মত। কোমরে বস্ত্র নেই বললেই চলে। একটা চাদর আছে। তাও সেটা খুলে খুলে যাচ্ছে। শুধু ল্যাঙ্গটটা রয়েছে। ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনেকেই ফিসফিস্ করে বলতে লাগলেন, ইনিই হলেন সাধু নিত্যগোপাল দাসজী। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সময় এর কথা আমরা কাগজে খুব পড়েছি। করসেবকদের বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে তোতাদ্রী মঠের মহান্ত মহারাজ বলেন ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী ছিলেন একজন গুপ্তযোগী। পাণিগ্রাহী হচ্ছেন অযোধ্যা আস্থানের গৌরব। আমরা সকলে তাঁর জন্যে গর্বিত। বিশিষ্ট সন্ত ছিলেন।

ছুপে হুয়ে এক সন্ত। আচারী তো পাণিগ্রাহীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণকান্ত আচারীয়াজী বললেন, আমরা তো সবাই কিংকর, তবু পাণিগ্রাহী ছিলেন বিশিষ্ট কিঙ্কর। জীবন কেয়া হোতা হ্যায়, জীবন কৈসে জীনা পড়ে গা—তো পাণিগ্রাহীকা জীবন সে মালুম পড়েগা!

বেশিরভাগ মহাত্মাই ফল ভোগ নিলেন। স্বরূপজী, অমলদা এরা সব এ-ক্লাস ফল কিনেছিলেন। গাইগরুর দুধ, বাঙালি রসগোল্লা, বড় বড় চৌসা আম—সাধুরা খুব তৃপ্তি করে সেবা গ্রহণ করলেন। সেনশর্মাদা সকল দিকে লক্ষ্য রাখছেন। কোন সাধু আসনে বসলেন, কে আসনে বসলেন না—সকল দিকে নজর রয়েছে। স্বরূপ কোন ত্রুটি রাখে নি। ব্রাহ্মণ পরিবেশক পর্য্যন্ত রেডি। কিন্তু জল দেবে কে? হঠাৎ দেখি দেবী জগে করে জল দিয়ে সেবা করে ধন্য হচ্ছে। যেখানে যেটুকু সেবা করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে নিজের থেকে সেই সেবাটাই করছে। পরে তো আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। কেউ পাতা কুড়োচ্ছে, কেউ বা পাতা পাতছে, কেউ বা এঁটো তুলছে। সবাই সব করছে হাসিমুখে। একটা জায়গাতে দেখলাম বিঠ্ঠলজী মঞ্চ থেকে নেমে এসে কার্পেটগুলো ঠিক করে পাতছেন। সাধুরা যে এখানে বসবেন। সব যেন সুন্দর হয়। সত্যম শিবম্ সুন্দরম্। সত্যই শিব্ আর শিবই সুন্দর। এই কারণেই কারুশিল্পের মাধ্যমেও শিল্পীরা শ্রীভগবানের স্পর্শ পান।

বর্ণনার দ্বারা এসব ভাণ্ডারার মাহাত্ম্য বোঝান যায় না। নিজে সেবায় অংশগ্রহণ না করলে এসব উপলব্ধি হয় না। হতে পারে না। অমলদা নিজে সুগারের রুগী। আম খাওয়া মানা হ্যায়। অথচ সেইদিন কত টাকার আম কিনেছেন ইয়ত্তা নেই। মহারাজের ঘরভর্তি আম। সেবকদের দু'হাত ভরে আম বিলিয়েছেন। নামকারীরা খুবই তৃপ্ত।

মহাপ্রয়াণ উৎসব শেষ। ভাণ্ডারা শেষ। শুধু দাগ কেটে গেল কয়েকটি কথা। নিত্যগোপালদাসজী মহারাজকে একবার জিজ্ঞেস করলেন বয়স কত হল? 'সত্তর'---শুনে হেসে ফেললেন। বললেন আমি ভেবেছিলাম পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। কৃষ্ণকান্ত আচারীজী একবার বিস্ময় প্রকাশ করলেন যখন শুনলেন বিঠ্ঠলজী ছিয়াত্তরটি আশ্রম (সারা ভারতে) দেখাশোনা করেন। আর একজন বললেন, কিঙ্কর শব্দটি বহুৎ মিঠা শব্দ হ্যায়, লেকিন বহুৎ বড়া শব্দ হ্যায়। একজন প্রশ্ন করলেন, অমন সুন্দর দেহের রূপ জৌলুস? উনি বললেন সব গুরুজীকা কৃপা সে।

বিকেলের দিকে সব চৌকিগুলো এক জায়গায় রাখা হয়েছে। চেয়ারগুলো চারপাশে আছে। মিটিং চলছে। অনেক দেনাদার এল। পাখা সারান'র মিস্ত্রি থেকে শুরু করে মুদিখানার দোকানদার। যার যা পাওনা ছিল সব একে একে মিটিয়ে দেওয়া হল। আগামী দিনের আশ্রম পরিচালনার কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল।

সন্ধ্যে নেমে এসেছে। লোডশেডিং চলছে। স্নান সেরে বিগ্রহ প্রণাম করে মহারাজকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। বললেন, সে কি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এত মিটিং হল? চুপ করে রইলাম। অথচ পাশের ঘরেই তো ছিলাম। কিছুই জানতে পারিনি, বুঝতে পারিনি। সত্যি আমি কোথায় ছিলাম? খাট, বিছানা, বইপত্র সব পড়ে আছে, কেমন এক অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে থাকা। মহারাজ বললেন, বড্ড অন্তর্মুখী হয়ে থাকছ, বেশ কয়েকবার ডাকলাম, শুনতে পেলে না? লজ্জিত হলাম। একটা সময় মনে হতো বিরাট বড় সংগঠন করবো, সবাইকে এক ছাতার তলায় আনবো, এখন আর সে ইচ্ছেটা নেই। ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনে হল আকাশের মাথায় ছাতা ধরা যায় না। নিজের মাথাতেই ছাতা ধরতে হয়। শীল দা, সেনশর্মাজী সব ট্রেনে করে কোলকাতা ফিরে গেলেন।

সারা মঠ নিস্তব্ধ। অন্ধকার। ছোট ছোট কয়েকটা ইমারজেন্সী লাইট জ্বলছে। দেবী একা পাণিগ্রাহীদার ঘরে শুয়ে আছে। শরীরের উপর দিয়ে কম ধকল যাচ্ছে না, 'ঘুমোক, ঘুমোক' বলে সরে গেলাম। এই ঘুমটার মধ্যে একটা অমৃতের স্পর্শ পাওয়া যায়। এই সময় কোথায় ছেলে, কোথায় বৌ? ঘুমটা ভাঙ্গলেও মানুষ আর একটু ঘুমতে চায়। একবার চোখ খোলে আর একবার বন্ধ করে। ঐ আরামটা সে ছাড়তে চায় না।

ঘুম নিয়ে বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজ খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন—'যো নিদ্রা অথবা সমাধি যব এত্তা

আরামকা চিজ হ্যায়, তব সাধককা সমাধিসে উত্থান হোতা হ্যায় কাহে, আউর সাধারণ মনুষ্য নিদ্রা সে উঠতা হ্যায় কাহে, উস্ আরামকো ভিতর কাহে নেহি রহতা হ্যায়, বাহার আতা হ্যায় কাহে, তব ইস্‌মে বুঝা যাতা যো কর্মসূত্র খেঁচকে লে আতা।... সংসারকে বিচ্ মে নিদ্রাকা মাফিক আউর কোই সুখ নেহি হ্যায়। এহি নিদ্রা হোগা কব? যব শরীর আরোগ্য রহেগা। ইস্ ওয়াস্তে বোলা হ্যায়, সংসারকা বিচ্ মে প্রথম সুখ কেয়া হ্যায়? নিরোগী কায়া। দুতিয়ে (দ্বিতীয়) সুখ? নিদ্রা রোগীকো নিদ্রা নেহি হোতা, আউর পাগল কো নিদ্রা নেহি হোতা। নিদ্রাকো বিচ্‌মে আদমী কো থোড়া অমৃত স্পর্শ হোতা হ্যায়।' একটু রান্নাঘরের দিকে এগুলাম। ওখানে গোপাল একা একা ভোগ রান্না করে চলেছে। কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী ভোগ রান্নার ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না, যদি না তার নিয়ম নিষ্ঠা ঠিক থাকত। রান্নাঘরে ভেন্টিলেশনটা ঠিক নেই। দরদর করে ঘামছে গোপাল। বেরিয়ে এল।

-হ্যাঁরে গোপাল তোর সঙ্গে স্বামীজীর কোন কথা হয়নি?

-আমাদের সঙ্গে কি কথা হবে বলুন, আমরা সব মুখ্যু সুখ্যু মানুষ!

-এ্যাই ধর, সিংহাসনে ন'টি বিগ্রহ কেন?

-হ্যাঁ, আমি স্বামীজীকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম। উনি বলেছিলেন উপরের তিনটি (সবচেয়ে বড়) প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। মাঝে তিনটি উৎসব বিগ্রহ। আর নীচের থাকে যে তিনজন আছেন—এরা হলেন শয়ন বিগ্রহ।

মহারাজের ঘরে আলো নেভা। উনি এসময়টা বিশ্রাম করেন। স্বরূপ চলে গেল। ওঙ্কারেশ্বরে ফিরে যাবে। দেবী পৌঁছে দিতে গেল স্টেশনে। ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরে এল। রাজধানী এক্সপ্রেস কোথায় লাইন চ্যুত হয়েছে। সব ট্রেন ক্যানসেল। মহারাজের ইচ্ছে ছিল না ---স্বরূপ ওঙ্কারেশ্বরে এক্ষুণি ফিরে যাক্। ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টের কথা শুনে স্বরূপও আর এগুতে চাইল না।

ভয়ানক গরম। ঘরে শোওয়া যাচ্ছে না। দালানে পাতা চৌকিটাতে শুয়ে আছি। এমন সময় সুধীর মহারাজ এসে হাজির। অম্বুবাচী চলছে, সুধীরদা অম্বুবাচী পালন করেন। সুধীরদা যেখানে যখন থাকেন সেখানে কথা হবেই হবে—সে 'রাম' কথাই হোক্ বা ভাগবত কথাই হোক। খুব সহজ সরল মানুষ। অনর্গল ভাগবতী কথা বলতে পারেন, চৌকির উপর বসে পড়লেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মহারাজ আপনি সেদিন গরুড় পুরাণ নিয়ে কি একটা বলছিলেন, আমার শোনা হয়নি, যদি একটু...

-সন্ধ্যা মূল। প্রথম সন্ধ্যা। মন একাগ্র হোতা। সংসার লোক ছুট যাতা। ভগবানে মন মিল হো যাতা।

কোনো লোক মারা গেলে আগে বাড়ীতে পুরাণপাঠ হত। গরুড় পুরাণই পাঠ করা প্রথা। অশৌচের তিনদিন থেকে শুরু করে দশদিনের মধ্যে পাঠ শেষ করতে হবে। তাহলে বাড়ীতে কোনো ভয় থাকে না। অশৌচ তো দুরকমের। শুভ অশৌচ আর অশুভ অশৌচ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পাঠ করেন। অনেক কিছু পুরান থেকে জানতে পারা যায়। অশৌচকালে দান দেবে না, দান নেবে না। দুজনেই যদি জেনে দেয় তাহলে দশদিন পর্যন্ত দান হয় না। এগারদিনের দিন প্রথম দান। প্রথম দান শয্যা, মহাব্রাহ্মণ বা মহাপাত্রকে দিতে হয়। প্রেতের দান ঘাটে, গোয়ালে। শয্যার উত্তর দিকে থাকবে। পরের দুটো দান —তার পূর্ব-পশ্চিম। গুরু পাবে, পুরোহিত পাবে। গরুড় পুরাণ যে পাঠ করে সেই পাবেন গ্রন্থটি। প্রাণীর মৃত্যুর পর প্রথম শ্রাদ্ধ। দশ প্রকারের শ্রাদ্ধ আছে। যেমন মৃত্যু তেমন শ্রাদ্ধ। মৃত্যু তিন প্রকারের—স্বভাবে, অপঘাতে, আত্মহত্যাতে। শ্রাদ্ধও তিনপ্রকার। তিনদিন পরে যদি মৃত্যু হয় তাহলে সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। আত্মহত্যার কোন শ্রাদ্ধ নেই। কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। আত্মহত্যাকারীর জন্যে কাঁদাটাও পাপ। দেখাটাও পাপ। দেখবে না, কাঁদবে না, ছোঁবে না। আত্মহত্যা মহাপাপ। এক বৎসর পরে কুশপুতলিকা দাহ করতে হবে। ঐ কুশপুতুল তৈরী করতে হলে তিনশ ছাপান্ন খানা পলাশ পাতা লাগবে। যব চূর্ণ দিয়ে বডিটা তৈরী করতে হবে। মাথাটা নারকেল দিয়ে করতে হয়। আমি (সুধীর মহারাজ) এরকম একটা কাজ করেছি। দেখেছি, ঠিক মানুষের মত পুড়তে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। বর্ণীবৎ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নারায়ণবলী যাগ করতে হবে। তারপর তো শ্রাদ্ধ হবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, মহারাজ আজ থাক্। অন্য কথা বলুন। আপনাদের বাড়ীর কথা বলুন। এরকম যা আগে কখন শুনিনি।

একবার, তিনজন সাধু মধুপুরা থেকে হাঁটতে হাঁটতে তেতেরিয়া বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় মাঝ রাস্তায় ওরা দেখেন কি, একজন ক্ষেতী মাঠে কাজ করছে।

তিনজনের মধ্যে একজন ঐ ক্ষেতীকে জিজ্ঞেস করছে—বংশীধরজীর বাড়ী (তেতেরিয়া ঠাকুরবাড়ী) কিতনা দূর?

সে কোন কথা না বলে লাঙ্গল দিয়ে মাঠ চষতে লাগল, আবার প্রশ্ন করলেন ওরা, বংশীধরজীর বাড়ী কিতনা দূর হ্যায় রে?

যথারীতি চাষীটা কোন উত্তর না দিয়ে মাঠ চাষ করে যেতে লাগলেন।

শেষবারের মত আবার ওরা জিজ্ঞেস করলেন, তেতেরিয়া ঠাকুর বাড়ী কিতনা দূর হ্যায় রে?

একই রকম। কোন উত্তর না দিয়ে সে কাজ করে যাচ্ছে। শেষে ওদের মধ্যে একজন বললেন, 'তুমি যদি বোবা হও তাহলে কালকেই তোমার মুখ খুলে যাবে। না হলে কালকেই তুমি বোবা হয়ে যাবে। আনেবালা সব বোবা হয়ে যাবে।' সেই বংশ আজও আমাদের গ্রামে আছে। এর থেকে একটাই শেখার সাধুকে কখনও অবজ্ঞা করবে না। সাধুর মর্যাদা রক্ষা করতে হয়।

সুধীর মহারাজকে প্রণাম করলাম। অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। এখন কত তারা আকাশে।

ভোরের আকাশে আলোর ফুল ফুটল। মহারাজের প্রাতর্ভ্রমণ শেষ হয়েছে। তবু গা ঘামানোর জন্যে মন্দিরের পেছনে একশ কুড়ি ফুট লম্বা দালানটাতে হাঁটতে লাগলেন। আর ঐ হাঁটতে হাঁটতেই সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। চক্রপাণিকে বললেন, পেছনে যে সিদ্ধিগাছের জঙ্গল হয়েছে এসব কেটে ফেল। লেবার লাগাও। এখানে ফুলের বাগান কর। মাথার উপর লোহার খাঁচা বানিয়ে দাও। যাতে বাঁদরে কোন উৎপাত করতে না পারে। তারপরে লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ, ওরা বলছিল তোমাকে এখানে রেখে যেতে। আমি বলি কি, তুমি আমার সঙ্গে তাড়িঘাট চল। কি রাজি আছ তো? আমি বললাম, আপনি যা বলবেন, এখানে আমার স্বাধীনতা কোথায়?

-গুড্, চল এখন আমরা সামনেটা ভাল করে দেখি। তুমি কি এখানে গুহাটা ভাল করে দেখেছ?

-না, (ভেতর ভেতর লজ্জিত হলাম, এতদিন আসছি আর গুহা ঘরটাই দেখিনি)।

-চল, দেখবে চল।

সব ঘুরে ঘুরে দেখা হল, তীর্থযাত্রীদের থাকার সুবন্দোবস্ত করার জন্যে চক্রপাণিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। আগামী দিনে তীর্থযাত্রীরা যাতে আমাদের আশ্রমে উঠতে পারে এবং থাকতে পারে তার জন্যে সবরকম প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। প্রায় ন'খানা ঘর উইথ অ্যাটাচড্ বাথ—সব যেন রেডি হয়ে যায়। কথা বলতে বলতে লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার আবার ঢিলেঢালা পছন্দ নয়। এগার হাজার টাকা দিলাম ঘরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আর ওঙ্কারনাথ মিশন থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হল, পেছনের বাগানটা তৈরী করার জন্য।

এদিকে নামকারী পাঁচুদা ঝোপজঙ্গলগুলো কেটে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মহারাজ ওদের সকলকে ডেকে বললেন, তোমরাও গুরুসেবা কর। যতটা পার সব পরিষ্কার করে দাও। এটাই তোমাদের করসেবা।

বহু ভাল ভাল শিক্ষিত লোক মন্দিরের চারপাশে বসতি স্থাপন করেছেন। সকলের কাছেই কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এখনও বেশ কিছু জায়গা জবরদখল হয়ে আছে। সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করার জন্য মহারাজ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

কাল অযোধ্যা ছেড়ে যেতে হবে। মহারাজ বলে দিয়েছেন, প্রসাদ পেয়েই বেরিয়ে পড়ব তাড়িঘাটের উদ্দেশে।

শ্রীরামজীর কাছেই বসে আছি। ধীর লয়ে কানাইদা নাম করছেন। ফলপ্রসাদ হয়ে গেছে। কেবলি বিদ্যানন্দজীর কথাই ভেসে উঠছে। মহামিলন মঠে তখন পাণিগ্রাহীদা অধ্যক্ষ। সকলের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেলে তারপর প্রসাদ নিতেন। শুনেছি শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন

সপ্ত ঋষির একজন ছিলেন পাণিগ্রাহীদা। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যারাকপুরের জাহ্নবী কুঞ্জে একটা খাতায় অনেকেরই জন্মান্তর লিখে গেছেন। কিন্তু খাতাটা আমি দেখিনি। আসলে বিদ্যানন্দজী পণ্ডিত হবার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নি। ওর ভেতরে কোন অন্ধকার ছিল না। ছিল আলোয় ভরা। ওর সঙ্গ করলেই সৎ সঙ্গের ফল পাওয়া যেত। কথা বললে বোঝা যেত সময় নষ্ট হচ্ছে না। একবার, গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। জনৈক যাত্রী এসে প্রসাদ চাইলেন। আমাদের সব প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে। পাণিগ্রাহীদা নিজে গিয়ে ভেতর থেকে পাতায় করে প্রসাদ নিয়ে এসে দ্যাখেন যে লোকটি চলে গেছে। মনটা খরাপ হল, ভাবলেন লোকটি শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পেল না? কিন্তু কেন পেল না—? তারপর উনি বিচার করে দেখলেন লোকটি আগে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম নিবেদন করে নি। তাই তার কপালে প্রসাদ জুটল না। ওকে বেশ কয়েকবার বলতে শুনেছি আগে প্রণাম তারপর প্রসাদ।

সামনে রথ। বিরাগদাকে পুরী যেতে হবে। ওখানে রথের দিন মহাপ্রসাদের ভাণ্ডারা হবে সব ঠিক করা আছে। বিরাগদা চলে গেলেন। সুধীরদাও চলে গেলেন। সুধীর মহারাজের নয়ন ভরা জল। অশ্রুসজল চোখে মহারাজও আলিঙ্গন দান করলেন। বললেন, ঠাকুরের প্রেমের রাজ্য।

আজ আর মহারাজ ঘর ছেড়ে বেশি বেরুলেন না। সারাদিনই স্বাধ্যায় করছেন। ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহীর সম্পাদনায় প্রকাশিত যতি ধর্ম সমুচ্চয় ঃ আচার্য শ্রী যাদব প্রকাশ বিরচিত গ্রন্থটি সারস্বত সাধকদের কাছে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে ছিল। মহারাজ দুটি কপি পেয়েছিলেন একটি নিজের কাছে রাখলেন আর একটি এই লেখককে দিলেন। মাধব স্বামীজীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে এই যতি ধর্ম সমুচ্চয় থেকেই মন্ত্রপাঠ করা হয়।

আজ সকাল থেকে দেখছি যতিধর্ম সমুচ্চয়টা মহারাজ পড়েই যাচ্ছেন। শুধু একবার মধ্যাহ্নের প্রসাদ পেতে উঠলেন। তারই মাঝে লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখেছ, ঐ সব প্রবচন দেওয়া যাবে না। ওতেও লোক আকর্ষণ করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়।

কিঙ্কর বিদ্যানন্দজী যতি ধর্ম সমুচ্চয়-র প্রস্তাবনাতে পাই—'বাংলা ভাষায় সন্ন্যাসধর্ম বিষয়ক কোন বিস্তৃত ও ধারাবাহিক গ্রন্থ না থাকায় মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব আমাকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে আমি এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে ব্রতী হই। অনুবাদের কিছু মুদ্রিত অংশ দেখিয়া তিনি পরমপ্রীত হন এবং মন্তব্য করেন—'উজ্জীবনে তোর লেখা যতিধর্ম সমুচ্চয় পড়ে আনন্দিত হলাম।' তিনি বর্তমানে স্থূলদেহে থাকিলে যে আরও আনন্দিত হইতেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। বস্তুতপক্ষে তাঁহার অফুরন্ত আশীর্বাদ ও নির্হেতুকী করুণাই আমাকে এই কার্যে প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।...'

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রীরঙ্গম্ (তামিলনাড়ুস্থিত) ফলাহারী জীয়র স্বামী মঠের অধ্যক্ষ উভয়বেদান্তবিদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডী শ্রীলক্ষণ রামানুজ জীয়র স্বামী পরম কৃপা করে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন—'শাস্ত্রনিষ্ঠ, সদাচার সম্পন্ন, বিদ্বদ্ বরেণ্য ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী এই মহান সন্ন্যাস ধর্মশাস্ত্রকে অনুরাগী ভক্তগণের অবগত করাইবার জন্য নির্হেতুক কৃপাবশতঃ বঙ্গভাষায় উহা অনুবাদ করিয়া যতি ধর্মশাস্ত্রের মহত্ত্ব প্রদর্শন করতঃ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।' যতদূর মনে হয় ওঁর (পাণিগ্রাহীদা) শেষ কাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যাখ্যা সম্বন্বিত ব্রহ্মানুসন্ধানের ইংরাজী অনুবাদ। গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারলেন না। মোটামুটি প্রস্তুতিপর্ব শেষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর 'ব্রহ্মানুসন্ধান' এর ওঙ্কারভাষ্য রচনা করেন শ্রীরামাশ্রমের পঞ্চবটীতে। ১৩৫২ অক্ষয় তৃতীয়ায়। পরিবর্ধন করেন ওঙ্কারেশ্বরের ওঙ্কারমঠে। ২৩শে ফাল্গুন ১৩৬২ দয়াল মহারাজের তিরোভাব। একাধারে যতিধর্ম সমুচ্চয় ভাবনা আর অন্যদিকে ব্রহ্মানুসন্ধানের ব্রহ্ম ভাবনাতে ডুবে থেকে তিনি কি ব্রহ্মবিৎ হন নি?

ব্রহ্মানুসন্ধান সম্পর্কে শ্রীঠাকুর লিখছেন, 'এই গ্রন্থমাত্র পাঠ্য নয়—সাধ্যও বটে, সাধন-সাধকও বটে।' ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মপদ লাভ করেন। মুণ্ডকোপনিষৎ বলছেন—যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, সেই বিদ্বান

ব্রহ্মস্বরূপই হন। তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিশেষরূপে বিযুক্ত হইয়া অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হন। 'যতিগণের সদাচারে পাওয়া যাচ্ছে ঃ শত্রু-মিত্র, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সর্বত্রই তাঁর সমবুদ্ধি থাকিবে। যে সন্ন্যাসী সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, তিনিই মুনি পদবাচ্য।' সকলে যে পাণিগ্রাহীদাকে স্বামীজী, স্বামীজী বলত তার কারণটা কি? উনি তো গেরুয়াও পড়েননি, কোথাও ভাষণও দেননি খুব একটা, তবে? নির্জনপ্রিয়তা ওর স্বভাব ছিল, কঠোরভাবে নিয়ম পরায়ণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি কখনও চান নি, চিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যা নিরত অহিংসা পরায়ণ ছিলেন—তা ওঁকে স্বামীজী বলবে না তো কাকে বলবে?

প্রণাম আচার্যদেব। প্রণাম, প্রণাম। এখন বুঝতে পারি ঐ বিশাল শ্রীরাম-জানকী মন্দির শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। আপনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান করলেন। আর আমরা মন্দিরটাকে দর্শন করে ব্রহ্মাভাষে ধন্য হব। আসলে এখানে এত বেশি ব্রহ্ম ভাবনা হয়েছে যে শ্রীরাম-জানকী মন্দিরটা একটা দুর্গের মত, এখানে থাকলেই, অবস্থান করলেই ব্রহ্ম-ভাবনার মধ্যে অভিসিঞ্চিত হতে হবে।

পুনশ্চ ঃ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার পরেরদিন (১৩ই জুলাই) কিঙ্কর বিদ্যানন্দের স্মরণসভা মহামিলন মঠের শ্রীগুরুমন্দিরের অডিটোরিয়ামে হল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে মঠটা ধুয়ে গেল। দেরী হল শুরু হতে। লোকজন আসতে শুরু করেছেন। এসেছেন পাণিগ্রাহীদার বোন, ভগ্নীপতি, অধ্যাপক ভাগ্নে। এসেছেন শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার জয় নারায়ণ সেন। মহারাজ জয় দিয়ে স্মরণ সভা শুরু করলেন। হঠাৎ করে নিজেই স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিলেন। আসতে আসতে উঠে আসছে ওর ভাই অধ্যাপক পরাশর চট্টোপাধ্যায়ের কথা। পাণিগ্রাহীদার কথা। ওরা দুজন একইসঙ্গে মহামিলন মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সে সব পুরানো সোনাঝরা দিনের কথা। বলতে বলতে থেমে গেলেন। মাইক এগিয়ে দিলেন কিঙ্কর সহজানন্দজীর দিকে (অধ্যাপক ডঃ গোপাল মিত্র দাদা'র দিকে) কিঙ্কর সহজানন্দজী পাণিগ্রাহীদার সঙ্গে তার সখ্যতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ ছিল গোটা মিত্র পরিবার। অযোধ্যা থেকে যখনই আসতেন তখনই তাঁর হাতে থাকত শ্রীরামজীর প্রসাদ। শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার শ্রীজয়নারায়ণ সেন তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। প্রথম দিনের দেখা হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। বলেন তাঁর বিস্ময়াভিভূত হওয়ার কথা—পাণিগ্রাহীদার ঐ বিশাল বিশাল ডিগ্রীগুলো দেখে অবাক্ হওয়ার কথা। বললেন, একবার মহামিলন মঠে ওর ভাষণ দেবার কথা। সময় নির্দিষ্ট ছিল তিরিশ মিনিট, কিন্তু সময় কমে দাঁড়াল দশ মিনিট, আর বিষয় ছিল ওঙ্কারবাদ। শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের একটি গ্রন্থ আছে ব্রহ্মানুসন্ধান, এখন সবচেয়ে কম লোক ঐ বইটি কেনেন, তার ওপর পাণিগ্রাহীদার দখল অসাধারণ, দশমিনিট বরাদ্দ সময়ে কি অপূর্বভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন যে আমার মত গর্দভও ব্যাপারটি উপলব্ধি করল। কিঙ্কর সামানন্দজী ছাত্র-পাণিগ্রাহীদার কথা উল্লেখ করেন। পরিণত বয়সেও যখন সংস্কৃত কলেজের টোলের অধ্যাপকের কাছে পড়তে আসতেন, বাংলাদেশে সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে রচিত যতিধর্ম সমুচ্চয় এর কথা উল্লেখ করেন। কীভাবে তাদের অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে, কোথায় তার মন্ত্র—সব পাওয়া যাবে ঐ গ্রন্থে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, স্মরণসভাকে দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষেপে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে বলেন মহারাজ। কিঙ্কর নয়ন, কিঙ্কর দেবীপ্রসাদ, কিঙ্কর সমীরণ সংক্ষেপে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পর কিঙ্কর শরণানন্দকে আহ্বান করেন। শরণানন্দজী বলেন, অযোধ্যাতে পাণিগ্রাহীদাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন সাধু সমাজ। একবার কোন একটি আশ্রমে পাণিগ্রাহীদা আমন্ত্রিত হয়েছেন। শরীর সাথ দিচ্ছে না, তবু হেঁটে হেঁটে নগ্নপদে গেলেন। পৌছুনো মাত্রই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা করে সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করেন—এ আমার নিজের চোখে দেখা। এরপর ওর ভগ্নীপতী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন।

আমরা সকলে মিলে এই শুক্ল সন্ন্যাসীর জন্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে জয় দিলাম।

মহারাজের সঙ্গে মহাপ্রয়াণ মঠে

কিঙ্কর সমীরণ

অযোধ্যার আশ্রমে প্রসাদ পেলাম তাড়াতাড়ি। বারবেলা পড়ার আগেই বেরুতে হবে। মহারাজের সেইরকম নির্দেশ।

গাড়ী যখন সরযূর পাশ দিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনি মহারাজ বললেন, চ'ল একটু সরযূকে দর্শন করা যাক্। বড় রাস্তা থেকে গাড়ী সোজা গড়িয়ে নেমে এল সরযূর পারে। রাস্তার এক পাশে। দর্শনের পর আবার যাত্রা শুরু।

বেশ কিছুটা আসার পর এক নতুন বিপত্তি। সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে, কি ব্যাপার? পুলিশ সব দোকান-এর সামনে বেরিয়ে থাকা শেডগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে। তাই দেখে স্বরূপ বলল, ঐ দেখুন সব অতিক্রমণ করেছে। তাই পুলিশ ভেঙ্গে দিচ্ছে। বড় বড় বুলডোজার, ক্রেন সব এসেছে।

কথায় কথায় আমাদের ওঙ্কারেশ্বরের কথা উঠল। মহারাজ বলছিলেন আমাদেরটাও ভাঙ্গা পড়ত কিন্তু শ্রীগুরুদেব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ঐ জন্যেই তো স্বরূপ ওঙ্কারেশ্বর মঠ ছেড়ে কোথাও থাকতে চায় না। কখন কোন ব্যাপারে দরকার পড়ে।

স্বরূপ বলল, সব ভেঙ্গে দিচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে। ওদের সুবিধে হয়েছে, গভর্মেণ্ট হাইকোর্টের অর্ডারটাকে ঢাল করেছে।

-কেন এমন হল?

-আরে হবে না কেন, যে যত পারছে পাহাড়টার উপর বাড়ীঘর বানাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাঁদর আটকাতে গিয়ে বাড়ীর চারধারে লোহার তারের বেড়া দিয়ে দিচ্ছে, আর তাতে ইলেকট্রিকের কারেণ্ট দিয়ে রাখত। একদিন একটা বাঁদর শক্ খেয়ে মারা যাওয়াতে এক পরিবেশ কর্মী হাইকোর্টে কেস করে দেয়। ব্যস, কেল্লাফতে, হাইকোর্ট অর্ডার দেয় সব বে-আইনি নির্মাণ ভেঙ্গে ফেল। পাহাড় পরিষ্কার কর। এদিকে সামনে উজ্জয়িনী কুম্ভ। সরকার চাইছে ওঙ্কারেশ্বর পাহাড়কে নতুন করে সাজাতে। তিনশ পঁচিশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে আমাদেরটা বাঁচিয়েছেন তা শুনলে অবাক হতে হয়। সে গল্প বারান্তরে বলা যাবে। গল্প বললাম বটে, আসলে এগুলো গল্প নয়, এগুলো শ্রীশ্রীঠাকুরের সুক্ষ্মলীলা। উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয়। মহারাজ বললেন, এখন আমাদের আট লাখ টাকা সরকারকে দিতে হবে ঐ জায়গাটার জন্যে। কি ভাগ্যিস সেইসময় সরকারের ঘরে একটা অ্যাপলিকেশন করে রেখেছিলাম।

চারপাশে শুধু সবুজ ক্ষেত। আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে চৌসা আমের গাড়ী। দু'কেজি পনেরো টাকা থেকে কুড়ি টাকার মধ্যে। আমরা গাজিপুর এসে গেলাম। শুনলাম, সেই পওহারী বাবার কথা। মহারাজ একবার এসে স্থানটি দর্শন করে গেছেন। বলছিলেন, পওহারী বাবা শুধু একটা বেলপাতা ও ঘি খেয়েও দিন কাটিয়েছেন। রাস্তা বড্ড খারাপ। খুবই সতর্ক হয়ে গাড়ী চালাতে হচ্ছে। মাঝে বৃষ্টি এল। গাড়ীর ভেতরে অনেকে বলাবলি করছে, দেখ মহারাজ বৃষ্টি নিয়ে মঠে ঢুকবেন। বেশ কিছুটা যাবার পর আবার বৃষ্টি উধাও। রাস্তার দু'ধারে দোকানগুলো দেখলে বোঝা যায় এ জায়গাটা বেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। বেশ কয়েকটা বড় বড় কলেজ দেখলাম। পেল্লাই তাদের চেহারা। ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছে বলেই না চলছে।

প্রায় সন্ধ্যা নামার একটু আগে আগেই আমরা তাড়িঘাটে পৌঁছে গেলাম। দূর থেকে গঙ্গা বয়ে চলেছেন। সেতুটাকে দেখা যাচ্ছে। আমরা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বিরাট উঁচু মাটীর বাঁধ। সামনেই সেই রেলওয়ে স্টেশন। দেখে বোঝা গেল তাড়িঘাট আছে তাড়িঘাটেই। সারাদিনে দুটো ট্রেন আসা-যাওয়া করে। এখনও অপু-দুর্গার মত ছুটে গিয়ে ট্রেন দেখতে ইচ্ছে করে। নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম হবে বলে কাঠামোটা করা আছে কিন্তু কাজ এগোয়নি। আর যা শুনলাম, এগুবেও না। দূরে গাজিপুরে একটা বড় স্টেশন হবে। এবারে সংসদে দু-দুটো এম.পি. গেছেন এই অঞ্চল থেকে। গাড়ী থেকে নামতেই ছুটে এল নিতাই। এই আশ্রমে মাস সাত-আট ধরে আছে। আগে বৃন্দাবনে ছিল, পুরীতে ছিল। শেষে এখন এখানে।

ফর্সা ধবধবে চাদর আর ধুতি পরে নিতাই ছুটে এল আমাদের অভ্যর্থনা করতে। কি অপূর্ব আশ্রমের পরিবেশ! বেশ পরিষ্কার ঝক্ঝক্ করছে আশ্রম। দেখলেই প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। ছবির মত, মাটির রাস্তা। জড়িয়ে ধরলাম। হঠাৎ বললাম, হ্যাঁরে তোর গা-টা তো বেশ গরম। ওহ! ঠিক আছে, রাত্রে কমে যাবে। কি ব্যাপার রে, রাত্রে কমে যাবে কি করে?

ও, যোগে বসব, জবাব দেয় নিতাই।

গাড়ী থেকে সব মালপত্র নামান হল। গাড়ীটাকে আশ্রমের বামপাশের মাঠটাতে রাখা হল। সবাই বেশ ক্লান্ত, তারই মধ্যে একটু ঘুরে সব দেখে নিলাম। মহারাজ ঘরে ব্যাগপত্র রেখে ফ্রেস হতে ছাতে চলে গেলেন। বলেই দিলেন ছাত থেকে আজ আর নামবেন না। আমরাও সেই দেখাদেখি ছাতে শোবার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের যাবার আগেই জব্বলপুর থেকে ভট্টাচার্য্য দাদা (বিজয় ভট্টাচার্য্য), ওর ভাই তীর্থ, উপাধ্যায় দাদা (সপরিবারে) এসে গেছেন। সমস্ত কিছু আয়োজন করে রেখেছেন। লোডশেডিং চলছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা জেনারেটর ওরা এনেছিলেন কিন্তু তেল নেই। শুনলাম এই জেনারেটরের মালিকের কুড়িখানা জেনারেটর ছিল। এখন অবস্থার বিপাকে খানি পাঁচেক আছে। আগে ওই মঠটার দেখভাল করত।

ঠিক দিগসুই এর সাধন সমিতির রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের মত এখানকার মন্দিরটা, ঢুকতেই ডানদিকে। ভেতরে পরমগুরুদেবের একটু মাঝারি সাইজের চিত্রপট আছে। আছেন শিবজী, বাহনসহ। শিবজীকে দেখলেই বোঝা যায় ওঙ্কারেশ্বর থেকে এসেছেন। বড় লক্ষণযুক্ত। একজনের মুখে শুনলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলে থাকাকালীন এই শিবজী প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রাঙ্গণের মধ্যে নতুন একটা চালা দিয়ে নাম-মঞ্চ বা বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় তুলসী কানন। একটা সোলার ব্যাটারী। রাত্রে ব্যাটারীর আলোতে সকলে মিলে প্রসাদ পাওয়া। কিন্তু ভয়ানক মশা। ছাদে মশারী না টাঙ্গিয়ে চাপা দিয়ে সব শুয়ে পড়লাম।

ব্রাহ্ম মুহূর্তের অনেক আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল মহারাজের। সব যে যার মত জপে বসে গেল। বোঝা গেল কেন সম্প্রদায়ের সাধুরা তাড়িঘাটকে এত বেশি পছন্দ করেন। সূর্যের আলো ফোটার পর আমরা সকলে মিলে চললাম গঙ্গা স্নান করতে আর মহারাজ চললেন আম বাগানে ওর প্রাতর্ভ্রমণে। আমাদের আশ্রমের পাশেই একটা বিরাট আম বাগান। গাছগুলোকে দেখলেই মনে হয় এরা সব প্রাচীন সাধু। বা-দিকের সীমানার কাছে আম গাছটাতে একটা বিরাট বড় খোদল আছে। একটা মানুষ অনায়াসে ভেতরে ঢুকতে পারে। শিমূল গাছটির কাছে তিনটি ঘর। তার সাথে একটা বড় দালান। সিঁড়িরতলায় একটা ঘর। সেখানেই নিতাই এর থাকার ব্যবস্থা। রক্তিমের মুখে শুনেছিলাম এখানে খুব সাপের উৎপাত। ঘরের ভেতর দিয়ে সাপ হেঁটে চলে যায়। একটু ভয় ভয় করছিল। পরে বুঝলাম নিতাই সব পরিষ্কার করাতে ওরা অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। নিতাইকে প্রশ্ন করাতে বলল, এখন আর ওদের বেশী দেখা যায় না, তবে দু'জন আছেন, বেশ বড় আকারে, গেটের সামনে শুয়ে থাকেন বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল।

দক্ষিণদিকে বাউণ্ডারীর সামনে একটি কল আছে। তার সামনে বেলগাছ, এদিকে আমলকী, তারই মাঝে একটি গম্বুজ ঘর। অনেকটা পেপসি বোতলের পেটটা কেটে যদি মাটিতে বসিয়ে দিলে যে রকম দেখতে লাগে ঠিক সেই রকমই দেখতে গম্বুজটা। শুধু ওপরে দুটো বিপরীতমুখী চোঙ্গা। একটা দিয়ে গরম বাতাস বেড়িয়ে যাবে আর একটা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে। এই ঘরটাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বেশিরভাগ সময়টাতে সমাধিতে কাটিয়েছেন, এখানেই অবতরণ হয় মহামিলন মঠের কথা। বলেছিলেন 'কোলকাতার কাছে তোদের একটা জায়গা দেখ।' এই মহাপ্রয়াণ মঠ থেকেই তিনি আহ্বান করেছিলেন মায়েদের, 'শাঁখা সিন্দুরে ফিরে আয় মা' বলেছিলেন, 'চারিদিকে ভোগের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।' সালটা ছিল ১লা ফাল্গুন ১৩৬৬। বলেছিলেন, মুখে নাম নিয়ে অনন্যভাবে পতিসেবা করে তোরা দেবী হ, দেবী হ, দেবী হ।

মহারাজ নিতাইকে বকাবকি করছেন। নিতাই কোত্থেকে একটা বাচ্ছা ষাঁড়কে নিয়ে এসেছে। মাথায় তার লক্ষণযুক্ত একটা কান রয়েছে। খুব সুন্দর দেখতে। কিন্তু নিতাই খাবে কি, আর ষাঁড়টাকেই বা কি খাওয়াবে? বললেন, যা গ্রামের লোকদের দিয়ে দে। ওরা জানে কীভাবে একে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। তুই পারবি না।

পরদিন সকাল থেকেই ভক্তদের আগমন শুরু হয়ে গেল। মহারাজ মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটা চৌকির উপর আসন পেতেছেন, আগত যাত্রীদের সাথে মনের আনন্দে কথা বলে যাচ্ছেন।

উপাধ্যায়জীর সব বড় বড় প্রতিষ্ঠিত এখানকার আত্মীয়েরা মহারাজ সন্দর্শনে এসেছেন। এদের মধ্যে একজন প্রফেসর আর একজন পণ্ডিত, সকাল থেকেই মহারাজের কাছে বসে রয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে মহারাজ অধ্যাপককে বললেন, তোমাদের এই পাশের আম বাগানটা ঠাকুরকে দিয়ে দাও। দরকার পড়লে ঠাকুর তোমাদের মার্কেট রেটই না হয় দেবেন। তিনি লজ্জিত হলেন। বললেন, ওর একার কিছু করার নেই, শরিকী সম্পত্তি। মহারাজের তো লক্ষ্য নতুন প্রজন্মের জন্যে। এখন ওখানে ছাগল চরছে। একটা বুড়ীকে দেখলাম ছাগল চরাচ্ছে। আর বাচ্ছাগুলো আম বাগানে ঢিল মেরে মেরে আম পাড়ছে।

আমরা সবাই গঙ্গাস্নান করে ফিরছি। হরিনাম নিয়ে ফেরা। মহারাজ একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবলাম কারা যেন মড়া পুড়িয়ে ফিরছে। আসলে

চেহারাগুলো আমাদের ঐ রকমের। মহারাজ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। অধ্যাপক মানুষটি বললেন, এরা সব বড় সাধু আছেন। মহারাজ বললেন, না। এরা গৃহী। সেই শুনে বললেন, ও তাহলে এরা সব বড় গৃহস্থী। গলায় অনেক মালা আছে। এখানে সন্ধ্যে থেকে লোকাল লোকেরা হরিনাম করবেন। প্রায় রাত এগারটা পর্যন্ত চলল। বহু ভক্ত প্রসাদ পেলেন। পুরী, সবজি, বোঁদে। এখানেই নিতাই মহারাজের কাছ থেকে ত্যাগ বস্ত্র পেল। ছিল ব্রহ্মচারী, হল বিরক্ত। রাত্রেই প্রসাদ পেয়ে বেড়িয়ে যাবার কথা হচ্ছিল। কিন্তু উপাধ্যায়-পরিবার ভীষণভাবে কাকুতি-মিনতি করছিল রাত্রে থেকে যাওয়ার জন্যে।

দুপুরবেলায় আমরা ক'জন হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম সেই স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের দিকে। যে কোয়ার্টারে আমাদের পরমগুরু শ্রীদাশরথিদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। আজ থেকে বিরাশি তিরাশি বছর আগের কথা দেড়খানা ঘর এখনও সেই রকমই আছে। ঘরের বাসিন্দারা জানেনই না এই ঘরটির স্থান মাহাত্ম্য আমাদের তরফ থেকে ঐ ঘরটি নেবার জন্যে রেল দপ্তরের সঙ্গে সে রকম আলাপ-আলোচনা চালানো হয়নি।

দুর্গাপুরের জনৈক সিংহ, রেলের কর্মচারী বর্তমানে ঐ ঘরটিতে থাকেন। কোয়ার্টারের সামনের ঘরটি বড়। ভেতরের ঘরটি ছোট। আট বাইদশ হবে বড় জোর। দুটো ছোট চৌকীপাতা পাশাপাশি। সিংহবাবু বললেন, আমি শুনেছি কোন এক মহাত্মা এই ঘরেই দেহরক্ষা করেছেন। আমি সেই জায়গাটায় পা দিই না। এই চৌকীটা ওর ওপর রেখেছি চৌকীর তলায় ঢুকে আমরা সবাই প্রণাম করলাম। কি অপূর্ব মসৃণ লাল মেঝে! বড় পবিত্র লাগল। উপায় নেই বলেই হয়তো ওদের ঘরটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। তবু ওরই মধ্যে স্থানটির পবিত্রতা রক্ষার জন্যে ওরা সদা সতর্ক। দেবীর এক প্রশ্নের উত্তরে সিংহবাবু জানালেন। এই আট বছরে আমি শান্তিতে আছি। আমার কোন অসুবিধে হয়নি। শুধু জায়গাটা আমরা ব্যবহার করি না। দেবী আবার প্রশ্ন করে—কোন বিশেষ অনুভূতি বা গন্ধ টন্ধ পান?

-হ্যাঁ তা পেয়েছি। বেশ কয়েকবারই বিভিন্ন সুন্দর গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে—এ অনুভব হয়েছে। আমরা আবার স্থানটিকে প্রণাম করে ফিরে এলাম। জব্বলপুরের বৌদি সকলের ফটো তুললেন।

মহারাজ সসঙ্গী স্টেশনের কাছে পায়চারী করছেন। একটু বাদেই ট্রেন আসবে। যাত্রীর ভীড় বেড়ে গেল। বড় বড় বক্স লাগিয়ে মাইকে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে—সব সেরে যাবে, পা থেকে মাথা।

ট্রেন এল। হুড়মুড় করে সব নামল আবার হুড়মুড় করে উঠে গেল। একটা নতুন জিনিস দেখালেন মহারাজ, দেখেছ, দেখেছ সাইকেল কিভাবে ট্রেনে চাপছে? তাকিয়ে দেখি প্রত্যেক বগির জানলায় সাইকেলটা উল্টিয়ে এমন সুন্দর করে বেঁধে দিয়েছে যে কোনরকম অ্যাকসিডেণ্ট ছাড়াই সাইকেল পৌঁছে যাবে পরের স্টেশনে। ভাবছি একটা পাথর লাগিয়ে দিলে কেমন হয়—লেখা থাকবে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের শ্রীগুরুদেব শ্রীদাশরথিদেব যোগেশ্বর ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র, কৃষ্ণা তৃতীয়ায় এই ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘরটি আমাদের সকলের কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থল। পরম গুরুদেবের জীবনের শেষ মুহূর্তের বর্ণনাটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কলমে তারপর মধ্যরাত্রে উঠিয়া বলিলেন, 'শৌচে যাব' বৌদিদি (পরমগুরু মা, হেমাঙ্গিনীদেবী) বলিলেন—'ঘরে বাহ্যে যাও'

ঠাকুর বলিলেন—'সেটা আউট অফ এ্যাটিকেট'। আমায় লাঠি দাও, নিজে লাঠি ধরিয়া, খড়ম গোলমাল ছিল, ঠিক করিয়া লইয়া শৌচে যাইলেন। স্বয়ং জলশৌচ করিয়া বলিলেন, 'আমায় ধর।'

বৌদিদি ধরিয়া লইয়া আসিলেন। তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করত বলিলেন—'পূজার জায়গা করে দাও, পূজা করবো।'

শঙ্কর (পরমগুরুপুত্র) বলিল 'বাবা, আপনি শুন, পূজা আমি করবো।'

ঠাকুর বলিলেন—'সন্ধ্যা তো করতে হবে?'

শঙ্কর বলিল—'বিছানায় শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যা করুন।'

মাথার শিয়রে গঙ্গাজল পাত্র রহিল। ঠাকুর শয়ন করিয়া জপ করিতে করিতে নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি অণামিকার মধ্যপর্বে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা আর বিযুক্ত করিতে পারা যায় নাই।'

এরপর শেষ বর্ণনাটা অসাধারণ, আরও মারাত্মক 'তাহার পর সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পূতদেহ ভাগীরথী গর্ভে চিতায় চিরতরে বিসর্জন দিয়া শঙ্কর বৌদিদি ও দিদিকে লইয়া শূন্যপ্রাণে ফিরিয়া আসিল।'

যেহেতু ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের গুরুদেবের মহাপ্রয়াণ এই তারিঘাটে হয়েছে, সেই ঘটনাকে জাগরুক করে রাখার জন্যই এই মঠটির নাম 'মহাপ্রয়াণ মঠ' রাখেন।

মহামিলন মঠে মহাসমারোহে শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসব

অন্যান্যবারের চেয়ে এইবারের শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসব বুঝি অনেক বেশী মাধুর্য্যমণ্ডিত। সমগ্র দিনব্যপী আকাশ নির্মল থাকায়, বারটি প্রায় অর্ধছুটির বার (শনিবার) হওয়ায়, সর্বোপরি সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজী পূর্বভাগেই ওঙ্কারেশ্বর থেকে এসে যাওয়ায় ৫।৬ হাজার ভক্তের ভিড়ে মহামিলন মঠ ছিল আনন্দ উদ্বেল। যথারীতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীগুরুপূজায় পৌরোহিত্য করেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন সর্বজনপ্রিয় মঠাধ্যক্ষ কিংকর প্রণবানন্দজী, যিনি বাকি অনুষ্ঠানগুলি সুপরিচালনাতেও বিশেষ দক্ষতা দেখান। নগর সংকীর্তনে উপস্থিত ভাইবোনেরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীগুরুবন্দনা গান ও নামকীর্তনে মধুবর্ষণ করে সংঘের শ্রেষ্ঠ সুরসাধক কিংকর বিপুলানন্দজী।

সর্বাধীশজী যথাকালে সীতারাম ভবনে দীক্ষাদান করেন শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেবের সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে, প্রায় তিনশত ভক্ত এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের দুর্লভ দীক্ষালাভে ধন্য হন।

শ্রীগুরুলীলা স্মরণে ভক্তদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন সংঘের শ্রেষ্ঠ গৌরব মহাসচিব শ্রীযুক্ত ডঃ গোপাল মিত্র, শ্রেষ্ঠ নামপ্রচারক এবং সেবানিষ্ঠ ট্রাস্টী কিংকর বিরাগানন্দজী, সর্বজনশ্রদ্ধেয় সহ-সর্বাধীশ তথা ওঙ্কারনাথ মিশনের আচার্য্য কিংকর সামানন্দ মহারাজ, ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সুবক্তা সমীরণভাই এবং সর্বভারতীয় মহাসচিব সুসংগঠক শ্রী দেবীপ্রসাদভাই, শ্রীগুরুসঙ্গী শরণানন্দজী, সর্বোপরি সুলেখক অনন্য সীতারামভক্ত ডঃ সুখেন্দু বাউর। সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় একান্ত যুগপ্রয়োজনীয়, সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজী রচিত **'উদ্বেগের অবসান'** গ্রন্থটির আবরণ উন্মোচন করেন ওঙ্কারনাথ মিশনের আচার্য্য ডঃ লোকনাথ চক্রবর্তী। একইসঙ্গে কিংকর শরণানন্দজী রচিত অপূর্ব গ্রন্থ **শ্রীশ্রীসীতারাম ভক্তমালিকার** আবরণ উন্মোচন করেন সর্বাধীশ। অপূর্ব পালাকীর্তনে শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় ৩ ঘণ্টা ভক্তবৃন্দকে আপ্লুত করে রাখেন।

খুবই সুচারুরূপে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় বিভিন্ন স্থানে, কর্ম পরিচালনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাগে।

বৈকালে মহামিলন সতীসংঘের সুমধুর নাম সংকীর্তন যেমন একটা আবহ সংগীত রচনা করে, সন্ধ্যাকালে স্বনামধন্য পালাকীর্তনীয়া শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্যের অতুলনীয় পালাকীর্তন তেমনি সভাস্থলকে পরমানন্দে বিভোর করে।

কিঙ্কর অকিঞ্চনানন্দজীর উদ্যোগে কলকাতা দূরদর্শন-এর প্রসার ভারতী সংবাদদাতা শ্রী সুরজিৎ বিশ্বাস ও ক্যামেরাম্যান শ্রী দেবপ্রিয় সরকারকে মহামিলন মঠের শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহোৎসবের কভারেজ করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঃ নিবেদক ঃ

কিংকর অরবিন্দ
সহ-মঠাধ্যক্ষ
মহামিলন মঠ

কিংকর দেবনাথ
কর্মাধ্যক্ষ
মহামিলন মঠ

শ্রীনামরক্ষা তহবিল ঃ একটি সম্মিলিত আবেদন

মহামিলন মঠ

ভারতবর্ষের সনাতন অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন ধারা সীতারাম মহাসিন্ধুতে এসে সম্মিলিত হয়ে বিশ্বের এক মহাবিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তবুও শ্রীভগবান সীতারামকে মুখ্যতঃ 'নামাবতার' রূপেই যুগের জ্ঞানীগুণী মনীষীরা চিহ্নিত করেছেন। তাই আমাদেরও প্রধান ও পরম পবিত্র কর্তব্য শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের ধারাটাকে সর্বদার জন্য উজ্জীবিত রাখা। এই মহান উদ্দেশ্যেই ইদানিং অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় তথা ওঙ্কারনাথ মিশনের ভাইবোনেরা মহামিলন মঠে এবং সাঁইবোনা নন্দদুলাল মন্দিরে মহাসমারোহে চাতুর্মাস্য নামযজ্ঞ শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, কালনা গৌরাঙ্গ মঠেও মহা সমারোহে ওঙ্কারনাথ মিশনের পরিচালনায় চাতুর্মাস্য যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও আশ্বাসের বিষয়—সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় মহামিলন মঠে তথা অন্যান্য মঠ আশ্রমেও নামসংকীর্তনের পুণ্য ধারাটিকে যাতে সমগ্র বৎসরই প্রাণপূর্ণ রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে ওঙ্কারনাথ মিশনের কর্ণধারগণ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন যথা- মিশনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় মহাসচিব কিংকর দেবীপ্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গের মিশনের বর্তমান কর্ণধার কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীনামনায়ক শ্রীমান্ নয়নভাই, প্রদেশের সচিব একনিষ্ঠ শ্রীগুরুসেবক কিংকর অরবিন্দভাই এবং মহামিলন মঠ কর্মাধ্যক্ষ তথা মিশনের কোষাধ্যক্ষ দেবনাথজী, শ্রীনামরক্ষক মিহির নস্কর ও নামপ্রেমী মৃণাল সাহা।

তাই সকল নামপ্রেমী ভক্ত অনুরাগীদের নিকট ঐকান্তিক নিবেদন নামাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণ এই হরিনাম সংকীর্তনকে রক্ষা তথা প্রচার প্রসার করবার জন্য মুক্ত হস্তে শ্রীনামরক্ষা তহবিলে দান করুন।

ঃ নিবেদক-মণ্ডলী ঃ

কিংকর সামানন্দ
সহ-সর্বাধীশ
আচার্য্য, ওঙ্কারনাথ মিশন

ডঃ গোপাল মিত্র
মহাসচিব
সভাপতি, ওঙ্কারনাথ মিশন

কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ
সর্বাধীশ
প্রতিষ্ঠাতা ওঙ্কারনাথ মিশন

কিংকর প্রণবানন্দ
অধ্যক্ষ, মহামিলন মঠ

শ্রী অনুপ দাস
সভাপতি, যুবক সংঘ

শ্রী প্রদীপ রায়
কার্য্যকরী সভাপতি, যুবক সংঘ

শ্রী ধ্রুবব্রত চক্রবর্তী
সচিব, যুবক সংঘ

ঃ যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

কিঙ্কর অরবিন্দ
৯৮০৪৫১০০২৫

কিঙ্কর দেবনাথ
৯৩৩০৯৭৯৬৯৮

কিঙ্কর নয়ন
৯৪৩৩৬৬৮৩৩৮

মহামিলন মঠ ঃ ২৫৭৭-৫১৭৯

ঃ সরাসরি দান পাঠানোর জন্য ঃ
A.B.J.S. A/c. Omkarnath Mission
AXIS Bank, Branch Dunlop
A/c. No. 912010058788274
IFSC : UTIB 0000236

আনন্দ সংবাদ

শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী। পিতা গজেন্দ্রনারায়ণ ত্রিপাঠী, মাতা শৈলজাদেবী। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ ইংরাজীর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুরের কাঁথি থানার অন্তর্গত আজন্তিতে জন্ম হয়।

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ থেকে ব্যাকরণ বিষয়ে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি। এরপর ১৯৪০ সালে ঐ সংস্থান থেকেই কাব্য বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও ১৯৪৫-এ বেদান্ত বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৪৭ সালে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৮-এ ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান খণ্ডে ২য় বিভাগে, ১৯৪৯এ শব্দখণ্ডে প্রথম বিভাগে এবং ১৯৫২ এ প্রাচীন ন্যায়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর সাধারণ দর্শন বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে ১৯৫৩ সালে ও পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৪ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ন্যায় মহাচার্য উপাধি পান।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে অধ্যাপনা চলে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৯৬৭-১৯৭১ এই পাঁচবছর পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ১৯৭২-১৯৮০ পর্যন্ত কাব্যভিন্ন প্রায় সকল শাস্ত্রই পড়ান। এর মধ্যে ১৯৭১ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র একমাসের জন্য ব্যাকরণ ও বেদান্ত বিষয়ে অংশকালীন অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৬-১৯৯০ পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে গবেষণা বিভাগে পাঁচবছর ভারতীয় দর্শনে গবেষণা-অধ্যাপকরূপে কাজ করেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট সম্মানে ভূষিত করেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারও পান। এবছর ২১ জুন কলকাতা গভঃ সংস্কৃত কলেজ এঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' সম্মানে ভূষিত করেছে। এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সম্মান প্রদান করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য দামোদর আশ্রম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ স্নেহ ও কৃপাধন্য ছিলেন। ঠাকুর তাঁর বর্ণাশ্রম বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করে তাঁকে কৃতার্থ করেছেন। আমরা এই বিদ্বদ্বরিষ্ঠ বন্দনায় আনন্দিত।

জয়গুরু

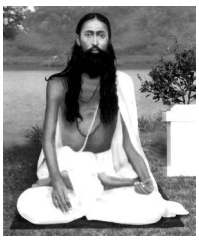

পরমগুরুদেব দাঁশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

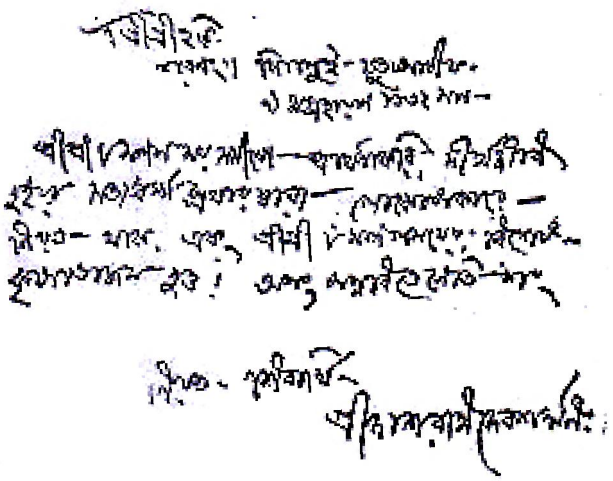

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

আষাঢ়, ১৪২১ তৃতীয় সংখ্যা

সূচী ঃ

● সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি □ প্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৮
● শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার পরিক্রমা □ হরিসাধন ভট্টাচার্য্য ৯২

সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি

প্র সা দ চ ন্দ্র মু খো পা ধ্যা য়

২৪শে শ্রাবণ, ৬৬—ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া বাবা তাঁর দৈনন্দিন কার্যসূচী অনুযায়ী প্রত্যেক কাজটি নিখুঁতভাবে সমাধা করিয়া চলিলেন। আজ মধ্যাহ্নে প্রার্থনার পর প্রণাম লইবার সময় বাবা বলিলেন ''তোরা তাড়াতাড়ি ২।৩জন একসঙ্গে প্রণাম সেরে নে। অনেক সময় নষ্ট করে দিচ্ছিস্। দিনেরবেলা একরকম প্রণামেই কেটে যায় বলে রাত্রি ২টা পর্যন্ত পত্র লিখেও ফুরুতে পাচ্ছি না। প্রণাম যদি বন্ধ করে দিই তাতেও তোরা কষ্ট পাবি!'' মন্দির হইতে ফেরৎকালে বাবা পাকশালার সংবাদ, রোগীর সংবাদ ইত্যাদি সমস্ত তথ্য লইয়া নাম নীড়ে ফেরৎ আসেন।

আজ হইতে ওঙ্কারমঠে লক্ষ আহুতি দেওয়া হইতেছে। অদ্যকার কর্মসূচী অন্যান্য দিনের ন্যায়।

২৫শে শ্রাবণ, ৬৬—বাবা আজ প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচাদি করত যথারীতি দৈনন্দিন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে গিয়া আজ মায়েদের পাঁচতলা পর্যন্ত উপরে লইয়া গেলেন।

সাহানাবাদের সিভিল সার্জেন ডাঃ তাণ্ডে আজ মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইলেন। তিনি হরেকৃষ্ণদার ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে আর কোন ভয় নাই। আরও অন্যান্য রোগীদের পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সপ্তাহে একদিন করিয়া নাম নীড়ে রোগী দেখিতে আসেন।

আজ ৪।৫জন দীক্ষা লাভ করিলেন। ইহাদের মধ্যে পুণা হইতে একজন ভাই ভবতোষদা প্রধান।

এতদঞ্চলের জনৈক সজ্জন আজিকার ভাণ্ডারি লইবার জন্য ১০১ টাকা প্রণামী দিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে এতদ্দেশীয়া জনৈকা ভক্তিমতী মহিলাও একদিন ১০০ টাকা প্রণামী দিয়া গেলেন।

আজ মধ্যাহ্নে প্রার্থনার পর হইতে 'নাম নীড়ে' লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি লওয়া হইতেছে।

অপরাহ্নে কলিকাতার ২।১ জন বিদায় লইলেন। সন্ধ্যায় ধর্মশালার মালিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবাকে প্রণাম করিয়া কি আদেশ জানিতে চাহিলে বাবা বলিলেন ''কতদিন পূর্বে ধর্মশালা হয়েছে একবার সমস্ত বাড়ীটি চুনকাম ও জানালা দরজায় রঙ করিয়ে দাও, আর নাম কর।''

ইহার পর বাবা যথারীতি কাজ করিয়া যাইলেন। এক বিন্দু বিশ্রাম নাই। ঐ ক্ষীণ দেহে এত শক্তি কোথা থেকে যে আসে তা তিনিই জানেন, সমস্ত দিন-রাত অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছেন। বিশেষ এবার চাতুর্মাস্য তিনি নিজে চালাইতেছেন। সমস্ত বিষয় তাঁর নখদর্পণে রহিয়াছে।

আজ হোলকার স্টেটের ম্যানেজার বাবার দর্শনে আসিয়াছিলেন।

২৬শে শ্রাবণ, ৬৬—আবও বাবা মন্দির হইতে ফিরিয়া হরেকৃষ্ণদার ছেলেকে দেখিয়া আসিলেন। হরেকৃষ্ণদাদাকে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরে তোর ছেলে কেমন আছে?' হরেকৃষ্ণদা বলিলেন 'ছেলে খুব ভাল আছে। দাস্ত সহজ ও প্রস্রাব পরিষ্কার হয়েছে, উত্তাপও ৯৮। আর একটু নামলেই বিজ্বর হয়, বাবা ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে বলিলেন 'জ্বরে আর বাকি কিরে।' হরেকৃষ্ণদা অন্নপ্রসাদ নিতে এসে বলিলেন যে বাবার বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ছেলের জ্বর ছাড়িয়া গেল—কৃপাময়ের অশেষ কৃপা!

মন্দির হইতে ফিরিয়া বাবা কয়েকজনকে মন্ত্র দিলেন। ওঙ্কারেশ্বরের রাজার উদ্‌যোগে আজ সন্ধ্যায় 'তুলসীদাস জয়ন্তী উৎসব পালিত হইল। বাবা

সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়া চমৎকার হিন্দি ভাষায় ভাষণ দিলেন। ইহার পর তাঁহার দৈনন্দিন কাজগুলি তৎপরতার সহিত সমাধান করিতে লাগিলেন।

২৭শে শ্রাবণ, ৬৬—আজ প্রাতে কয়েকজন গুরুভাই বাঙলা হইতে এবং লেফট্‌ন্যাণ্ট কর্ণেল সুজন সিং সস্ত্রীক মউ হইতে আসিলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন গুরুভগিনী।

মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রার্থনা হইল। আজ হইতে সকলে একসঙ্গে প্রার্থনা আরম্ভ হইল এবং বাবা মাতার প্রণাম মন্ত্রটি প্রার্থনার সহিত আজ হইতে সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

'সর্ব দুঃখ নিহন্ত্রী চ ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাতৃদেবি নমো♦স্তুতে।।'

আজ গুরুবার একারণ বাবা গুরুগীতা হইতে প্রণাম মন্ত্রগুলি সব পাঠ করাইলেন। আশ্রমের লক্ষ হোম আজ সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর অদ্যকার কর্মসূচী পূর্ববৎ।

পূর্ব পূর্ব দিনের মত বাবা আজও তাঁর কর্মসূচী অনুযায়ী সকল কর্ম সম্পাদন করলেন। আজ মধ্যাহ্ন হতে বাবা সঙ্গীত শিক্ষণ আরম্ভ করালেন। শিক্ষক নিযুক্ত করলেন প্রণবজীকে; আর প্রথম ছাত্র সচ্চিদানন্দ ভাই। কানপুরের কালীদা ও পুণার ভবতোষদা বিদায় নিলেন। আজও কয়েকজনের দীক্ষা হল। এঁদের মধ্যে একটি বালক ও একটি বালিকাও ছিল।

বাংলার আরও কয়েকজন গুরুভাই আজ বিদায় নিলেন। অদ্যকার অবশিষ্ট কার্য্যসূচি অন্যান্য দিনের ন্যায়।

২৯-৪-৬৬—আজ প্রাতঃকালীন প্রার্থনা ও প্রণামের পর বাবা বললেন যে যদি সীতারামের রাগ হয় তাহলে সীতারাম সে বেলা উপবাস করবে এবং তিনঘণ্টা আসনস্থ থাকবে। বাবারা মায়েরা যদি রাগ করে ঝগড়া করে তাহলে সে বেলা উপবাস করবে এবং ১০০০০ ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাই।' কুটাই মা বললেন—কাকামণি আপনার রাগ হলে আমি উপবাস করবো নচেৎ কেউ খেতে পাবে না।

আজ মৌ হইতে কর্ণেল লচ্‌মন সিং ও লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট সুকুমার গড় সস্ত্রীক বাবাকে দর্শন করতে এলেন। তাঁরা অন্নপ্রসাদ নিয়ে অপরাহ্নে বিদায় নিলেন। বিকেলে আজ তাঁর পত্র সেবা স্থগিত রেখে আমাদের সকল গুরুভাই ভগ্নীদের ব্যক্তিগত আবেদন নিবেদন শুনলেন।

রাত্রে যথারীতি কর্মসূচী নিষ্পন্ন করলেন। ছেলেরা রাত্রে সকালে প্রসাদ নিয়েছে কিনা, তারা রাত্রে কি খাবে, কোথায় শোবে প্রভৃতির ব্যবস্থা করে বাবা পত্র সেবা করতে নিভৃত কুঞ্জে প্রবেশ করলেন।

৩০-৪-৬৬—আজ সকালে আসানসোলের সুধাকর গাঙ্গুলী সপরিবারে বিদায় নিলেন। ভূপালের সেক্রেটারী হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদায় নিলেন। আজও একজন স্থানীয় ও একজন খাণ্ডোয়ার পাঞ্জাবীভাই দীক্ষা লাভ করলেন।

বাবার কর্ম তৎপরতায় বিস্মিত হতে হয়। আজ খাণ্ডুয়ার ভরত ভায়াকে ১০০০ ব্রাহ্মণের পদধূলি নেবার জন্য ধূলির মোড়ক করে দিতে আদেশ করলেন। কিন্তু তাঁর যাওয়ার সময় হয়ে এলো, অথচ মোড়ক তৈরী হল না দেখে নিজেই মোড়ক তৈরী করতে বসে গেলেন, ও সকলের চেয়ে তাড়াতাড়ি মোড়ক তৈরী করতে থাকলেন—তিনি বললেন তোরা যদি আমার মত পারবি তবে আমি বাবা হলুম কেন?

আজ বাংলা হতে সনৎ দত্ত ও রমেশদা বহু দ্রব্যাদি নিয়ে এলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি যথারীতি সকল কাজই করে গেলেন।

৩১-৪-৬৬—আজ বাবা ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির হতে ফেরার পথে হঠাৎ নর্মদা হতে এক কলসী জল তুলে আনলেন। এসে আমাদের বললেন 'ভগবান রামানুজাচার্য্য কাঞ্চীতে রোজ ২ ক্রোশ দূরে শালকূপ থেকে জল নিয়ে এসে ভগবান বরদরাজের সেবা করতেন। সীতারামও পুঁরীধামে ও দিগসুই চাতুর্মাস্যকালে রোজ কলসে করে জল এনে ভগবানের সেবা করতো। কিন্তু গত দু'বৎসর মৌন থাকায় সব ভুলে গেছি। আজ হঠাৎ মনে পড়ে তাই আজ থেকে পুনরায় করলাম।

আজও বাংলা থেকে অনেকে আসিলেন। দু-একজন এই দেশীয় লোকের দীক্ষাও হল। বাবার দৈনন্দিন কর্মধারা ঠিকভাবেই সম্পন্ন হল।

অনেকের পেটের অসুখ হওয়ায় কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে নর্মদার জল খেয়ে সব অসুখ করছে। বাবা সে কথায় বাধা দিয়ে বললেন নর্মদার জল কত পাহাড় ধুয়ে আসছে এতে কতরকম পদার্থ মিশে আছে। ঋষিরা কতকাল থেকে এ জলের পবিত্রতা ঘোষণা করে আসছেন।'

সান্ধ্য প্রার্থনায় পূর্বে বাবা আজ এক ঘণ্টারও বেশি তাঁর ক্ষেপার ঝুলি ও ব্রজনাথগাথা থেকে পাঠ করে শোনালেন। ক্ষেপার ঝুলি হতে প্রায়শ্চিত্ত, নিজের চরকায় তেল দাও ও কোষ্ঠী পাথর পাঠ করলেন। উহাদের সার অংশ যথাক্রমে।

১ম। মনে মনে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে প্রকৃতই প্রায়শ্চিত্ত হয়। যেমন মনে মনে পরনারী সঙ্গসুখ লাভ করা হয় তেমনি মনে মনে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তও করা যায়।

২য়। পরের দোষ বিচার না করে নিজের দোষ সংশোধন করা।

৩য়। নিন্দা ও স্তুতিতে দ্বেষ বা আনন্দ না করা। বিশেষতঃ কেহ নিন্দা করলে তাকে হিতকারী বলে জানবে। যে হেতু সে তোমার কৃত পাপের ক্ষয় করে দিচ্ছে। উদাহরণ কোন এক দেশের রাজার কুষ্ঠ ব্যাধি হওয়ায় তাঁর গুরুদেব তাঁকে তাঁর বিধবা যুবতী কন্যার সহিত প্রমোদ উদ্যানে নিভৃতে থাকতে বলেন। এদিকে রাজ্যে রাজার নিন্দায় কান পাতা যায় না। এই অবস্থায় কিছুদিন পরে রাজা দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে সুস্থ দেহে প্রমোদ উদ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন।

অতঃপর বাবার বাকি কাজগুলির তিনি কোনটিই আর অসম্পূর্ণ রাখলেন না।

১লা ভাদ্র ৬৬—সকলকে বিস্ময়ান্বিত করে বাবা আজ অন্যান্য দিনের অপেক্ষা প্রত্যুষে নিভৃত কুঞ্জ হতে বেরিয়ে শৌচে এলেন। আজও বাবা মন্দির হতে আসবার সময় এক কলস জল আনলেন।

আজ বোলপুর হতে বাবার ২০।২৫ জন ছেলেমেয়ে এসেছেন। কলিকাতা হতেও ডাঃ উমেশ দাও সপরিবারে এসেছেন। আজ প্রায় ৮।১০ জনের দীক্ষা লাভ হল।

আজকের অবশিষ্ট দিনের কর্মসূচী পূর্বদিনের মতই অনুষ্ঠিত হল।

২রা ভাদ্র ৬৬—আজ বাবা মন্দির হতে ফিরে আশ্রমে (ওঙ্কার মঠে) সস্ত্রীক ডাঃ উমেশ চক্রবর্তী আদি কয়েকজনকে পুনরায় বসালেন।

গঙ্গাদা, কিঙ্কর সন্তদাস ও ভবানন্দ অপরাহ্নে বিদায় নিলেন। ভবানন্দ চন্দননগর আশ্রমে সেবা কাজে ব্রতী হল। বিদায়কালীন বাবা গঙ্গাদাকে দশেড়ে অনন্ত কালোদিষ্ট নাম করে কথায় বললেন সীতারামের প্রতিজ্ঞা কখনও ভিক্ষা করবে না। টাকার জন্য ভাবিস না। টাকা আপনি আসবে। টাকা আকাশ থেকে পড়বে।

গঙ্গাদা, কিঙ্কর সন্তদাসের সঙ্গে দশেড়ের অখণ্ড নামের সুব্যবস্থা করে কাঁথি যাবেন। সেখানে একটি আশ্রম গ্রহণ করবার জন্য সেখানকার ভায়েরা প্রার্থনা জানিয়েছেন।

এই সময় বাবা বললেন 'শুধু কিঙ্কর বললে বামুন শুদ্দুর বোঝা যায় না। তাই বামুন কিঙ্করের বেলায় দেব কিঙ্কর বলা হোক্। তোরা কি বলিস্?'

বাবার পরবর্তী কর্মধারা সমভাবেই চললো।

৩রা ভাদ্র ৬৬—আজ প্রাতে বৃন্দাবন মাল্যবতী আশ্রম হতে ৩টি কিঙ্করী ও কলিকাতা হতে ২।৪জন গুরুভাই এলেন।

গতকাল বোলপুর হতে যারা এসেছেন তাঁদের অনেকের আজ দীক্ষা হল। এদের একটি অনূঢ়া কন্যা ফ্রক্ পরে মন্দিরে যাওয়ায় বাবা তার অভিভাবককে বললেন, 'এত বড় মেয়ে কাপড় পরে না? তোদের লজ্জা করে না? সীতারাম টাকা দেবে, একে এখনি কাপড় কিনে দে।' মন্দির হতে ফিরে বাবা এ মেয়েটিকেও দীক্ষা দিলেন।

অবশিষ্ট দিন অন্যান্য দিনের ন্যায় অতিবাহিত হল।

৪ঠা ভাদ্র ৬৬—বাবা আজ মধ্যাহ্ন প্রার্থনার পর শ্লেটে অদ্যকার রক্ষাকারিদের পালার হিসাব লিখে দিলেন। উহার প্রথমেই তাঁর চিরাচরিত ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ লেখা দেখে তাঁর ছেলেরা ৭' এর ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে বাবা বললেন 'এ হল সৃষ্টি রহস্য। প্রথম মহাকাশ বা পরম আকাশ তাতে বিন্দুর (০) উৎপত্তি; তা থেকে নাদ (ঁ) বা ধ্বনি উত্থিত হল, ও শেষে নাদ থেকে সপ্ত লোক (৭) ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সপ্ত লোক সৃষ্টি হল।

আজ মেমারী থেকে প্রায় ১০।১২ জন গুরুভাই এলেন। অপরাহ্নে আড়িয়াদহের ভাই এরা বিদায় নিয়ে বাংলায় ফিরে গেলেন। হরেকৃষ্ণদার ছেলেটি আজ বাবার অন্নপ্রসাদ পথ্য পেল। অবশিষ্ট দিন বাবা অন্যান্য দিনের মতই অতিবাহিত করলেন।

৫ই ভাদ্র ৬৬—আজ বাবা সাড়ে এগারটায় অন্নভোগ নিবেদন করে পুরীধামাভিমুখে যাত্রা করলেন। পুরীর মিউনিসিপ্যালিটি জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দরজায় অখণ্ড নাম মণ্ডপ ভেঙ্গে দিবার জন্য নোটিশ করেছেন। বাবা তাই তথাকার নাম মণ্ডপ রক্ষা করার জন্য সেখানে গেলেন। বাবার সঙ্গে বিমলদা, কানপুরের টেলাসজী সদানন্দ (সনৎ দত্ত, শক্তিগড়) ও প্রণবজী গেলেন।

বাবার কৃপায় আজ নামযজ্ঞ ভালই চলল। সান্ধ্য আরত্রিকাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হল। অমৃত বাজারের রমেশদাকে পত্র দেন তরুণ ভাইকে এ সংবাদ জানাবার জন্য পুলিশসাহেব তারকদাদাকেও পত্র দেন। গত পরশু লিঙ্গরাজদাদা পুরীধাম হতে পত্র দেন। নাম মঙ্গপ ভাঙ্গার কথা। তাতে জেনে কাল বাবা বহরমপুরের গোবিন্দ চৌধুরী দাদা ও পুরীর নির্মল ডাক্তার দাদা ও মন্মথদাদাকে পুরীর নাম মণ্ডপ রক্ষা করবার জন্য টেলিগ্রাম করেন।

৬ই ভাদ্র ৬৬—আজ বাবার অনুপস্থিতে তাঁর দৈনন্দিন কার্য্য পদ্ধতিগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালিত হল। প্রভাতে মঙ্গল আরতি, পূজাদি নাম নিয়ে প্রাতে ১০টায় মন্দির গমন। ফিরে এসে প্রার্থনান্তে ফল প্রসাদ গ্রহণ। মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি সমাপনান্তে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ। একটা কথা বলা হয়নি বাবা নিত্য এক টাকা করে নর-নারায়ণদের দান করবার আদেশ করেছেন— আমি নিত্য আট আনার জিলাপি ইত্যাদি আর নগদ আট আনা দিই।

আজ মৌ হইতে কর্ণেল সুজন সিং আদি কয়েকজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ও মহিলা এসেছেন। সানাবাদ হতেও কয়েকজন গুরুভাই এসেছেন। বোলপুরের ভাইবোনেরা সকলে প্রাতেই বিদায় নিলেন।

অবশিষ্ট দিন পূর্বদিনের ন্যায় অতিবাহিত হইল।

৭ই ভাদ্র ৬৬—আজ প্রাতে শ্রীমতী রাধাদেবী গোয়েনকা এম.এল.এ, সাহিত্য রত্ন, বাবাকে দর্শন করিতে এলেন। বলাবাহুল্য বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি সাতিশয় ব্যাথা পেলেন। বাবার অনন্তলীলা। মনে হয় তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত পুস্তকগুলির হিন্দি অনুবাদ ও প্রকাশ করবার জন্যই যেন রাধাদেবীকে আকর্ষণ করলেন।

আজ ২।৩জন বাঙালি ভাইবোনও এলেন। প্রভাতে মঙ্গল আরতি হতে আরম্ভ করে বাবার দৈনন্দিন কার্য্যসূচী যথাযথ ভাবে পালিত হল।

৮ই ভাদ্র ৬৬—আজ প্রাতে ৭টার সময় বাংলা হতে পণ্ডিত শ্রীমৎ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় সস্ত্রীক ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করতে এলেন। সঙ্গে বেদ বিদ্যালয়ের গোপালভাই ও আর একটি গুরুভাই এলেন।

আজিও দৈনন্দিন কার্য্যসূচীর কোনরকম ব্যতিক্রম হয়নি।

৯ই ভাদ্র ৬৬—আজ প্রাতে বাংলা হতে কতিপয় গুরুভাই বোন এলেন। তাঁদের মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জনৈক অধ্যাপক আছেন।

আজ পুরীধাম হতে গোবিন্দ চৌধুরীদা টেলিগ্রামে জানিয়েছেন যে পুরীর পশ্চিম দরজায় অখণ্ড নামের আর কোন গণ্ডগোল নাই; সব মিটে গেছে। শ্রীনাম সুষ্ঠুভাবেই চলছে।

বাবার অনুপস্থিতে সবাই যেন মনমরা। আনন্দময়ের অভাবে অফুরন্ত আনন্দ যেন আর নাই।

গতকাল হতে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণ অনেকের শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। উপরন্তু জন্মাষ্টমী পড়ায় সকলে দিনের বেলায় উপবাসী রইল অবশিষ্টকাল পূর্বদিনের মতই চলল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার পরিক্রমা

হরিসাধন ভট্টাচার্য্য

(২)

বাবা বললেন 'এবার আসমুদ্র হিমাচল নাম প্রচার হয়ে গেল। ওদিকে বোম্বাই প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হয়ে দ্বারকা ও ভেট দ্বারকা সমুদ্র তীর থেকে আরম্ভ করে রাজস্থান, যোধপুর, জয়পুর হয়ে বৃন্দাবন, দিল্লী, কানপুর শেষ করে বাংলা তারপর এদিকে হিমালয় পর্য্যন্ত নামপ্রচার হল। বাকী রয়ে গেল আসাম, মণিপুর প্রভৃতি। এই জলপাইগুড়িও বাদ ছিল মায়ীটি (আশুদার স্ত্রী) কোলকাতা, মধুপুর, কাশীতেও সীতারামকে ধরতে না পেরে শেষে দিল্লীতে গিয়ে প্রার্থনা করে যেতেই হবে। মাত্র ৩ দিনের জন্য টাকার শ্রাদ্ধ করে প্লেনে সকলকে নিয়ে এল।'

অনুমান রাত্রি ৯টায় বাবা জলপাইগুড়িতে আশুদার বাড়ীতে ফিরলেন। প্রণাম নিয়ে প্রসাদ গ্রহণের পর রাত্রি ৬টার সময় বাবার বিশ্রামের অবসর হয়।

৮ই মাঘ বাবা প্রাতঃকালীন পূজাদি সেরে বাড়ীর রোয়াকে রোদে বসে প্রণাম নিতে থাকেন তারপর দীক্ষার্থীদের প্রাথমিক কিছু কাজ দিয়ে ফলপ্রসাদ নিয়ে আবার প্রণাম নিতে বসেন। আজ বেশ ভীড় হয়েছে প্রায় ৬।৭ শো। দীক্ষার্থীর সংখ্যাও শতাধিক। দীক্ষান্তে আমাদের বললেন তোরা ঐ গাড়ীতে যা সীতারাম এখনি জেলখানা দর্শন করতে যাবে। বাবা জীপে উঠে বসতেই সারথি একেবারে জেল গেটের সামনে রথ স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুব ভীড় জমে গেল, বাবা জেল গেটের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। পূর্বে এখানের জেলার ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়দা। বর্তমান জেলার শ্রীযুক্ত ঘোষাল মহাশয়ও বাবার অনুরক্ত ভক্ত এবং তিনি শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। ডেপুটি জেলার ভূজঙ্গভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাবার শ্রীচরণানুগমন করতে ভেতরে ঢুকলেন।

বন্দীগণ পূর্ব থেকেই হারমোনিয়াম খোল-করতাল নিয়ে নাম করছিলেন বাবা যাওয়া মাত্র তাদের আর আনন্দের সীমা ছিল না। বাবা এই ভয়ঙ্কর কারাগারকেও মুক্তির দ্বার করে তুলেছেন। বাবা তাদের নামকীর্তন শুনে বললেন—কোথায় এলাম রে? এ যেন বৈকুণ্ঠধাম। বাবা এসেই বন্দীদের দিকে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ হলেন। তারপর সকলে একযোগে এসে বাবাকে আক্রমণ করলেন। আবার সেই প্রণামের হুড়োহুড়ি। সকলেই দণ্ডবৎ হয়ে বাবার চরণে পড়তে লাগলেন। অনেকের নয়নের জলধারা গণ্ড বেয়ে পড়ছে। কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে উঠছেন আর করুণকণ্ঠে বলছেন, ঠাকুর কৃপাময়! অধমদের কৃপা করুন। কি অদ্ভুত দৃশ্য! আজ বন্দীদের জেলে আসা সার্থক হয়েছে। তাঁদের দুষ্কর্মও আজ সুফল দান করেছে! নররূপী ভগবানকে দর্শন করে আজ তারা কৃতার্থ হয়েছে এবং নিজে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছে। তাঁরা প্রণাম করছেন আর বাবা তাঁদের বুকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করছেন। তারপর বাবা মায়ী বন্দিনীদের কাছে এলেন। বাবা জেলারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন মায়ী কতজন? তিনি বললেন ১৫জন, আর পুরুষবন্দী ২৫৬জন।

বাবা বললেন গত বৎসর এখানে মৃত্যুঞ্জয়ে জেলার ছিল সে, যখন নিয়ে এসেছিল তখন দেখে গেছলাম এক মায়ী তার স্বামীকে খুন করে জেলে এসেছে। এই বোধহয় দুমাস পূর্বে সে আবার আসানসোল জেলে নিয়ে যায়। সাড়ে পাঁচশো বন্দী আছে সেখানে তার মধ্যে কতজন জেলের ভিতরে দীক্ষাও নেয়। আমাকে বাবা বললেন কতজন রে? বললাম বাবা ৮জন।

তারপর মণীন্দ্রবাবু বাবাকে বললেন—বাবা আমি পরশু রাত্রে আপনার শ্রীমুখের বাণী শুনে এসেছি। আমার বহু প্রশ্নের উত্তর সেদিনে আপনার ভাষণে লাভ করে কৃতার্থ হয়েছি। এখন এদের একটু কৃপা করে উপদেশ দিন। এরা অসৎ পথ ছেড়ে চিরদিনের জন্য যেন সৎ পথানুসরণ করে। আপনার চরণে আরও প্রার্থনা করি এরা ভাল হয় যেন, এবং প্রকৃত মানুষ হতে পারে এই আশীর্বাদ করুন। বাবা বন্দীদের উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিতে লাগলেন—

বাবারা তোমরা কেবল এই নামকীর্তন করবে। যে পাপের ফলে বহু দুষ্কর্ম করেছিলে তারপর জেলে এসেছো আজ তোমাদের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে গেছে। নাম করা মানে ভগবানকে আশ্রয় করা, সেহেতু তোমাদের আর কোন ভয় নাই নির্ভয়ে নাম করবে তাহলে চিরদিনের জন্য নির্মল হয়ে যাবে। তোমরা সকলেই চাও আনন্দ, সুখ ও শান্তি। যে চোর সে মনে করে চুরির মধ্যে সুখ আছে আনন্দ আছে তাই চুরি করতে যায়। কিন্তু সে চোর বলে যে নীচ হবে ঘৃণ্য হবে তা নয়। সে চেয়েছিল আনন্দ চেয়েছিল শান্তি। আনন্দের সন্ধানে গিয়ে সে চুরি করে ফেলেছে। প্রারব্ধবশে মানুষ দুষ্কর্ম সকল করে ফেলে। তা বলে কি তার গতি নাই? না—আছে।

ব্যাপার হচ্ছে—মানুষ বার থেকে সুখ নেব আনন্দ পাব বলে ছুটে চলেছে। সকলে খোঁজে আনন্দ। কিন্তু আনন্দ তো বাইরে নাই, আনন্দ নিজের হৃদয়ে আছে। ভেতরে আনন্দের রাজ্য আলোর রাজ্য ধ্বনির রাজ্য আছে। নাম করতে করতে সেখানে পৌঁছে যাবে। লক্ষ্য রাখবে যাতে একটা শ্বাসও যেন বৃথা না যায়। আরে কত কত জন্মের সাধনার ফলস্বরূপ এ মানব শরীর। সহসা জীবের মানুষ জন্মলাভ হয় না। তাই এ জন্ম শুধু ভোগের জন্য নয়। ভোগে তৃপ্তি নেই শান্তি নেই আছে শুধু জ্বালা। ভোগ এবং আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন মানুষের যেমন আছে পশুরও আছে। তাহলে পশু মানুষে তফাৎ কি?

না—মানুষের ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিচার বোধ আছে পশুর নাই। ধর্মাচরণই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর এই কলিযুগে নামই পরমধর্ম নাম করা পরম তপস্যা।

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি কীর্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈঃ সমাচরেৎ॥

নামকারীকে ভগবান দর্শন দেন বর দেন। পাপী তাপী রোগী শোকী যে কেহ হওনা তুমি নাম কর। পাপী তোমার ভয় নাই তুমি নাম কর তোমার পাপ করার আর সামর্থ্য থাকবে না। নাম করতে করতে তাপীর তাপ যাবে, রোগীর রোগ যাবে, শোকীর শোক থাকবে না, অভাবীর অভাব যাবে। যাবেই যাবে। আর একটা কথা ভগবান প্রত্যেককে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই একটি পরম রত্ন দান করেন। সে রত্ন একবার গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। সে মহারত্নকে খুব সাবধানে রক্ষণ করতে হয়! জান সেটি কি রত্ন? সে রত্ন হচ্ছে 'চরিত্র'। এ অমূল্য নিধি যার নষ্ট হয় তার সব যায়। সেজন্য পুরুষ স্ত্রী থেকে স্ত্রী পুরুষ থেকে দূরে থাকবে। আর তোমরা কাউকে দ্বেষ করবে না হিংসা করবে না কারুর প্রতি আঘাত করবে না। কারণ ভগবানই সব সেজে লীলা করছেন। যাকে আঘাত করবে ভগবানকে আঘাত করা হবে। ভগবান হৃদয়ে বাস করছেন। যে যা কর্ম করুক না কেন শ্রীভগবান হৃদয়ে বসে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি সতত তাঁর সন্তানদের ডাক্‌ছেন ওরে আমার নাম করে তোর কায়িক বাচিক মানসিক পাপ অশান্তি দূর হয়ে যাবে।

তন্নাস্তিকর্মজংলোকে বাগ্‌জংমানসমেব বা।
যন্নক্ষপয়তে পাপংকলৌ গোবিন্দকীর্তনাৎ॥

শ্রীভগবান বলেন এমন কোন পাপ নাই যা আমার নামকীর্তনে ক্ষয় না হয়। তোর জ্বালা অশান্তি থাকবে না, আমি তোকে বুকে তুলে নেব। কেবল সময়ের অপেক্ষায় আছি, নাম কর্ সময় হলেই আমার দেখা পাবি। তাই বলছিলাম উঠতে বসতে খেতে শুতে হেলায় শ্রদ্ধায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভক্তিতে অভক্তিতে যে কোন প্রকারে নাম করলে কৃতার্থ হবে হবেই। নাম-নাম- নামই এ যুগের একমাত্র উপায়।

তারপর বাবা উঠে দাঁড়ালেন, বন্দীরা আবার সেখানে মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করে প্রণাম করে জয়ধ্বনি করলেন—গুরুমহারাজকী জয়। জেলার মণীন্দ্রবাবু বাবাকে নিয়ে জেলের বাইরে এলেন। সেখানে বাসায়

বাবা পদধূলি দিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। প্রায় ১০।১২টি বাড়ীতে পদধূলি দিতে দিতে হরিজন পল্লীতে উপস্থিত হলেন। এরা সেদিন তাদের কাজে যায়নি। তারা যখন স্থানীয় বাবার ছেলেদের বলে তখন ছেলেরা এসে বাবাকে তাদের আবেদন জানান। বাবা তাদের মুখে শুনে হরিজনদের কৃপা করবার জন্য এলেন। তারা তাদের বসতির একধারে একটি স্থান সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। প্রথমে বাবা সেখানে উপস্থিত হলেন তারা মাল্যভূষিত করে চরণে লোটাতে থাকে। ২।৩ শত নরনারী সকলেই প্রণাম করবার জন্য ঠেলাঠেলি করতে থাকে। বহুলোক নামকীর্তনও করতে থাকে। তারা আবার প্রার্থনা করে, বাবা আমাদের বসতির মধ্যে একবার যাবেন? বাবা সম্মতি দিতেই তারা বাবাকে সেখানে নিয়ে যায়। সেখানেও সুসজ্জিত একস্থানে নাম চলছিল। তারা বাবাকে বলেন আমাদের উপদেশ দিন। বাবার উপদেশের সারাংশ এই—

শোন সকলে—আজ তোমরা সীতারামকে পেয়ে যে আনন্দ লাভ করেছ, সীতারামও তোমাদের কাছে এসে তদ্রূপ আনন্দ পেয়েছে। তোমরা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় সুবিধেমত মিলিত হয়ে এইভাবে নামকীর্তন করবে। এর দ্বারাই তোমরা কৃতার্থ হয়ে যাবে। নাম আর ভগবান তো আলাদ নন। ব্রাহ্মণাদি অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে যাদের অধিকার আছে তারা সুষ্ঠুভাবে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের পর যে ফল প্রাপ্ত হয় তোমরা মাত্র সেবার দ্বারা ও নামকীর্তনের দ্বারা সেই ফল সেই গতি লাভ করবে। শাস্ত্রই স্ত্রী, শূদ্র, অধম দ্বিজগণের বেদে অধিকার দেন নাই। সেই শাস্ত্রই বলেছেন এই কলিযুগে যে কেহ হোক না কেন শ্রীভগবানের নাম করলে নামাশ্রয় গ্রহণ করলে সে পরমগতি লাভ করবেই।

কি আমাদের বেদে অধিকার নাই? এই বলে লড়াই করলে হয় না। প্রেমের দ্বারা ভগবান সন্তুষ্ট হন, লড়াই এর দ্বারা নয়। এই প্রেমের পথে নামের পথে সকলের অধিকার আছে। তোমরা হেলায় শ্রদ্ধায় যে কোন প্রকারে সর্বদা নাম নিয়ে থাকার চেষ্টা করবে। তোমরা কোন দুষ্ট নেশা করবে না, মদ খাবে না, উঠতে বসতে খেতে শুতে কেবল নাম করার চেষ্টা করবে। তাহলে তোমরাও পরম পবিত্র হবে, দেবতা হয়ে যাবে। জগতে কোন মানুষই ঘৃণ্য নয়, নীচ নয়। ভগবানই সব সেজে বিরাজ করছেন। জগতের মূল সূত্র হল— 'বহুস্যাং প্রজায়েয়মিতি।' ভগবানের হৃদয়ে তখন এইভাব জেগেছিল বহু হব জন্মাব। তিনি তাঁর অপৃথকভূতা শক্তির সাহায্যে বহুরূপ ধারণ করলেন। নরনারী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, সাগরভূধর সবই তাঁর লীলা বিগ্রহ। একবার বহু বৎসর পূর্বে সীতারাম কোলকাতায় শ্যামবাজারের দিকে যায়, গিয়ে দেখলাম বিরাট একটা ড্রেন কত নোংরা মল-মূত্রাদি নিয়ে বয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম ঠাকুর তোমার কি লীলা! তুমি যদি 'ড্রেন' নর্দমা প্রভৃতি রূপ ধারণ না করতে তাহলে কোলকাতা দুর্গন্ধে মলমূত্রে ভরে যেত। দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলাম, করজোড়ে দাঁড়িয়ে সে রূপ সে লীলা দেখলাম। জগতে এমন কিছু নাই যা ভগবান নয়। সবই ভগবান এই বোধে প্রণাম করা ও নাম করাই চরম সাধনা।

তারপর হরিজনগণ বলেন বাবা আমাদের মন্ত্র দিন। বাবা বললেন আচ্ছা তোরা গুরুনাম জপ কর। গুরু গুরু গুরু গুরু জপ কর, আর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই মহামন্ত্র জপ জপ কর। তারাও সব জপ করতে লাগল। বাবা আবার তাদের বললেন তোদের ভালবাসাই দক্ষিণা। সন্ধ্যায় সকলে মিলে এই নামকীর্তন করবি, আর তোরা মদ খাবি না। বাবা এই বলে সেখান থেকে বেরিয়ে আর এক বাড়ীতে পদধূলি দিয়ে আশুদার বাড়ীতে ফিরে এলেন।

'আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখান' আমাদের বাবার আচরণ করা কেন? তিনি ভগবান, তাঁর কাছে অপবিত্র বলতে কিছু নেই অসত্য, অধর্ম, পাপ বলতেও কিছু নাই। তবু তিনি আচরণ করেন কেন?

ক্রমশঃ